বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ১০০ মনীষীর জীবনী থেকে

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ১০০ মনীষীর জীবনী থেকে

(৫৭০-৬৩২ খ্রি.)

যে মহামানবের সৃষ্টি না হলে এ ধরাপৃষ্ঠের কোনো কিছুই সৃষ্টি হতো না, যার পদচারণে লাখ পৃথিবী ধন্য হয়েছে; আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও ভালোবাসা, অন্তরের পবিত্রতা, আত্মার মহত্ত্ব, ধৈর্য্য, ক্ষমতা, সততা, নম্রতা, বদান্যতা, মিতাচার, আমানতদারি, সুরুচিপূর্ণ মনোভাব, ন্যায়পরায়ণতা, উদারতা ও কঠোর কর্তব্যনিষ্ঠা ছিল যার চরিত্রের ভূষণ; যিনি ছিলেন একাধারে ইয়াতিম হিসেবে সবার স্নেহের পাত্র, স্বামী হিসেবে প্রেমময়, পিতা হিসেবে স্নেহের আধার, সঙ্গী হিসেবে বিশ্বস্ত; যিনি ছিলেন সফল ব্যবসায়ী, দূরদর্শী সংস্কারক, ন্যায়বিচারক, মহৎ রাজনীতিবিদ বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)। তিনি এমন এক সময় পৃথিবীর বুকে আবির্ভূত হয়েছিলেন যখন আরবের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিকনৈতিক ও ধর্মীয় অবস্থা অধঃপতনের চরম সীমায় নেমে ,সাংস্কৃতিক ,সামাজিক , গিয়েছিল।

৫৭০ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ আগস্ট মোতাবেক ১২ রবিউল আউয়াল রোজ সোমবার প্রত্যুষে আরবের মক্কা নগরীতে সমভ্রান্ত কুরাইশ বংশে মাতা আমেনার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। জন্মের ৫ মাস পূর্বে পিতা আবদুল্লাহ ইন্তেকাল করেন। আরবের তৎকালীন অভিজাত পরিবারের প্রথানুযায়ী তাঁর লালন-পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পিত হয় বনী সা'দ গোত্রের বিবি হালিমার ওপর। এ সময় বিবি হালিমার আরেক পুত্রসন্তান ছিল, যার দুধ পানের মুদ্দত তখনো শেষ হয়নি। বিবি হালিমা বর্ণনা করেন 'শিশু মুহামমদ কেবলমাত্র আমার ডান স্তনের দুধ পান করত। আমি তাঁকে আমার বাম স্তনের দুধ দান করতে চাইলেও, তিনি কখনো বাম স্তন হতে দুধ পান করতেন না।' আমার বাম স্তনের দুধ তিনি তাঁর অপর দুধ ভাইয়ের জন্য রেখে দিতেন।' দুধ পানের শেষ দিবস পর্যন্ত তাঁর এ নিয়ম বিদ্যমান ছিল। ইনসাফ ও সাম্যের মহান আদর্শ তিনি শিশুকালেই দেখিয়ে দিয়েছেন। মাত্র ৫ বছর তিনি ধাত্রী মা হালিমার তত্ত্বাবধানে ছিলেন। এরপর ফিরে আসেন মাতা আমেনার গৃহে। ৬ বছর বয়সে তিনি মাতা আমেনার সাথে পিতার কবর জিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদিনা যান এবং মদিনা থেকে প্রত্যাবর্তনকালে 'আবওয়া' নামক স্থানে মাতা আমেনা ইন্তেকাল করেন। এরপর ইয়াতিম মুহাম্মদ (সা.) এর লালন-পালনের দায়িত্ব অর্পিত হয় ক্রমান্বয়ে দাদা আবদুল মোত্তালিব ও চাচা আবু তালিবের ওপর। পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ যে মহামানব আবির্ভূত হয়েছেন সারা জাহানের রহমত হিসেবে; তিনি হলেন আজন্ম ইয়াতিম এবং দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়েই তিনি গড়ে ওঠেন সত্যবাদী, পরোপকারী এবং আমানতদারি হিসেবে।

তাঁর চরিত্র, আমানতদারি ও সত্যবাদিতার জন্যে আরবের কাফেররা তাঁকে 'আল আমীন' অর্থাৎ 'বিশ্বাসী' উপাধিতে ভূষিত করেছিল। তৎকালীন আরবে অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা, হত্যা, যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদি ছিল নৈমিত্তিক ব্যাপার। 'হরবে ফুজ্জার'-এর নৃশংসতা বিভীষিকা ও

তাণ্ডবলীলা দেখে বালক মুহামমদ (সা.) দারুণভাবে ব্যথিত হন এবং ৫৮৪ খ্রিষ্টাব্দে মাত্র ১৪ বছর বয়সে চাচা হযরত যুবায়ের (রা.) ও কয়েকজন যুবককে সাথে নিয়ে অসহায় ও দুর্গত মানুষদের সাহায্যার্থে এবং বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে শান্তি, শৃঙ্খলা ও ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠার দীপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে গড়ে তোলেন 'হিলফুল ফুজুল' নামক একটি সমাজসেবামূলক সংগঠন। বালক মুহাম্মদ (সা.) ভবিষ্যৎ জীবনে যে শান্তি স্থাপনের অগ্রদূত হবেন এখানেই তার প্রমাণ মেলে।

যুবক মুহাম্মদ (সা.) এর সততা, বিশ্বস্ততা, চিন্তা-চেতনা, কর্মদক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতায় মুগ্ধ হয়ে তৎকালীন আরবের ধনাঢ্য ও বিধবা মহিলা বিবি খাদিজা বিনতে খুইয়ালিদ বিবাহের প্রস্তাব দেন। এ সময় বিবি খাদিজার বয়স ছিল ৪০ বছর এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর বয়স ছিল ২৫ বছর। তিনি চাচা আবু তালিবের সমমতিক্রমে বিবি খাদিজার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। বিবাহের পর বিবি খাদিজা তাঁর ধন-সম্পদ হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর হাতে তুলে দেন। কিন্তু তৎকালীন আরবের কাফের, মুশরিক, ইহুদি, নাসারা ও অন্যান্য ধর্ম মতাবলম্বীদের অন্যায়, জুলুম, অবিচার, মিথ্যা ও পাপাচার দেখে হযরত মুহামমদ (সা.) এর হৃদয় দুঃখ বেদনায় ভরে যেত এবং পৃথিবীতে কীভাবে ইনসাফ ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা যায়, সে চিন্তায় তিনি প্রায়ই মক্কার অনতিদূরে 'হেরা' নামক পর্বতের গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকতেন। বিবি খাদিজা স্বামীর মহৎ প্রতিভা ও মহান ব্যক্তিত্ব উপলব্ধি করতে পেরে হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে নিশ্চিত মনে অবসর সময় 'হেরা' পর্বতের গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকার পূর্ণ সুযোগ দিয়েছিলেন। ক্রমান্বয়ে তাঁর বয়স যখন ৪০ বছর পূর্ণ হয় তখন তিনি নবুয়্যত লাভ করেন এবং তাঁর ওপর সর্বপ্রথম নাজিল হয় পবিত্র কোরআনের সূরা-আলাকের প্রথম কয়েকটি আয়াত। এরপর সুদীর্ঘ ২৩ বছরে বিভিন্ন ঘটনা ও প্রয়োজন অনুসারে তাঁর ওপর পূর্ণ ৩০ পারা কোরআন শরিফ নাজিল হয়।

নবুয়্যত প্রাপ্তির পর প্রথম প্রায় ৩ বছর তিনি গোপনে স্বীয় পরিবার ও আত্মীয়ের মধ্যে ইসলামের দাওয়াত প্রচার করেন। সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেন বিবি খাদিজা (রা.) এরপর যখন তিনি প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার শুরু করেন এবং ঘোষণা করেন, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' তখন মক্কার কুরাইশ কাফেররা তাঁর বিরোধিতা করতে শুরু করে। এত দিন বিশ্বনবী (সা.)। কুরাইশদের নিকট ছিলেন 'আল আমীন' হিসেবে পরিচিত; কিন্তু এ ঘোষণা দেয়ার পর তিনি হলেন কুরাইশ কাফেরদের ভাষায় একজন জাদুকর ও পাগল। যেহেতু কোরআন আরবি ভাষায় নাজিল হয়েছে এবং আরববাসীদের ভাষাও ছিল আরবি, তাই তারা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বাণীর মর্মার্থ অনুধাবন করতে পেরেছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল যে, মুহাম্মদ (সা.) যা প্রচার করছেন তা কোনো সাধারণ কথা নয়। যদি এটা মেনে নেয়া হয় তাহলে তাদের ক্ষমতার মসনদ টিকে থাকবে না।

তাই তারা হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে বিভিন্ন ভয়, ভীতি, হুমকি, এমনকি ধনদৌলত ও আরবের শ্রেষ্ঠ সুন্দরী যুবতী নারীদের দেয়ার লোভ দেখাতে শুরু করে। মুহাম্মদ (সা.) কাফিরদের শত ষড়যন্ত্র ও ভয়-ভীতির মধ্যেও ঘোষণা করলেন, 'আমার ডান হাতে যদি সূর্য আর বাম হাতে চাঁদও দেয়া হয়, তবু আমি সত্য প্রচার থেকে বিরত থাকব না।' কাফিরদের কোনো লোভ-লালসা বিশ্বনবী (সা.) কে ইসলাম প্রচার থেকে বিন্দুমাত্র বিরত রাখতে পারেনি। মক্কায় যারা পৌত্তোলিকতা তথা মূর্তি পূজা ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল কুরাইশরা তাঁদের ওপর অবর্ণনীয় নির্যাতন শুরু করে। কিন্তু ইসলামের শাশ্বত বাণী যাঁরা একবার গ্রহণ করেছে তাঁদের শত নির্যাতন করেও ইসলাম থেকে পৌত্তোলিকতায় ফিরিয়ে নিতে পারেনি।

৬২০ খ্রিষ্টাব্দে মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনসঙ্গিনী বিবি খাদিজা (রা.) এবং পরবর্তী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে চাচা আবু তালিব ইন্তেকাল করেন। জীবনের এ সংকটময় মুহূর্তে তাঁদের হারিয়ে বিশ্বনবী (সা.) শোকে-দুঃখে মুহ্যমান হয়ে পড়েন। বিবি খাদিজা ছিলেন বিশ্বনবীর দুঃসময়ের স্ত্রী, উপদেষ্টা এবং বিপদ আপদে সান্ত্বনাস্বরূপ। চাচা আবু তালিব ছিলেন শৈশবের অবলম্বন, যৌবনের অভিভাবক এবং পরবর্তী নবুয়্যত জীবনের একনিষ্ঠ সমর্থক। ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি স্বীয় পালিত পুত্র হযরত যায়েদ বিন

হারেসকে সঙ্গে নিয়ে তায়েফ গমন করলে সেখানেও তিনি তায়েফবাসীদের কর্তৃক নির্যাতিত হন। তায়েফবাসীরা প্রস্তরাঘাতে বিশ্বনবীকে জর্জরিত করে ফেলে।

অবশেষে ৬২২ খ্রিষ্টাব্দের ২ জুলাই (নবুয়্যতের ত্রয়োদশ বছর) ইতিমধ্যে মদিনায় ইসলামী আন্দোলনের একটি উপযুক্ত ক্ষেত্র তৈরি হয়েছিল। মদিনা বাসীগণ মুহাম্মদ (সা.)-এর কার্যপদ্ধতিতে এক বিরাট পরিবর্তন এনে দেয়। এত দিন মক্কায় ইসলাম ছিল কেবল একটি ধর্মের নাম; কিন্তু মদিনায় এসে তিনি দৃঢ় ভিত্তির ওপর ইসলামী রাষ্ট্র গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। এতদুদ্দেশ্যে তিনি সেখানে চিরাচরিত গোত্রীয় পার্থক্য তুলে দেন। সে সময় মদিনায় পৌত্তোলিক ও ইহুদিরা বিভিন্ন গোত্রে বিভক্ত ছিল। মুহাম্মদ (সা.) মনে-প্রাণে অনুভব করতে পেরেছিলেন যে, যেখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের বাস সেখানে সকল সম্প্রদায়ের সমর্থন ও সহযোগিতা না পেলে ইসলামী রাষ্ট্রের ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়বে। তাই তিনি সেখানে সকল সম্প্রদায়ের লোকদের নিয়ে একটি সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন এবং একটি আন্তর্জাতিক সনদপত্রও স্বাক্ষরিত হয়, যা ইসলামের ইতিহাসে 'মদিনার সনদ' নামে পরিচিত। পৃথিবীর ইতিহাসে এটাই ছিল প্রথম লিখিত শাসনতন্ত্র বা সংবিধান। উক্ত সংবিধানে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক অধিকার, জান, মাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার কথা ঘোষণা করা হয়।

মুহাম্মদ (সা.) হন ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সভাপতি। তিনি যে একজন দূরদর্শী ও সফল রাজনীতিবিদ এখানেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মদিনার সনদ নাগরিক জীবনে আমূল পরিবর্তন আনে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্থাপিত হয় ঐক্য। বিশ্বনবী (সা.) তলোয়ারের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেননি বরং উদারতার মাধ্যমেই ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর ও নবদীক্ষিত মুসলমানগণের (সাহাবায়ে কেরাম) চালচলন, কথাবার্তা, সততা ও উদারতায় মুগ্ধ হয়ে যখন দলে দলে লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করতে লাগল তখন কুরাইশ নেতাদের মনে হিংসা ও শত্রুতার উদ্রেক হয়। অপরদিকে মদিনার কতিপয় বিশ্বাসঘাতক মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রাধান্য সহ্য করতে না পেরে গোপনভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। কাফিরদের বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করার জন্যই মুহাম্মদ (সা.) তলোয়ার ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ফলে ঐতিহাসিক বদর, উহুদ ও খন্দকসহ অনেকগুলো যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং এসব যুদ্ধের প্রায় সবগুলোতেই মুসলমানগণ জয়লাভ করেন। বিশ্বনবী (সা.) মোট ২৭টি যুদ্ধে প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

৬২৭ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক ষষ্ঠ হিজরিতে ১৪০০ নিরস্ত্র সাহাবিকে সঙ্গে নিয়ে মুহাম্মদ (সা.) মাতৃভূমি দর্শন ও পবিত্র হজ পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা রওনা দেন। কিন্তু পথিমধ্যে কুরাইশ বাহিনী কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যা ইসলামের ইতিহাসে 'হুদায়বিয়ার সন্ধি' নামে পরিচিত। সন্ধির শর্তাবলির মধ্যে এ কথাগুলোও উল্লেখ ছিল যে-(১) মুসলমানগণ এ বছর ওমরা আদায় না করে ফিরে যাবে (২) আগামী বছর হজে আগমন করবে, তবে ৩ দিনের বেশি মক্কায় অবস্থান করতে পারবে না (৩) যদি কোনো কাফির স্বীয় অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত মুসলমান হয়ে মদিনায় গমন করে তাহলে তাকে মক্কায় ফিরিয়ে দিতে হবে। পক্ষান্তরে মদিনা হতে যদি কোনো ব্যক্তি পলায়নপূর্বক মক্কায় চলে আসে তাহলে তাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে না (৪) প্রথম থেকে যে সকল মুসলমান মক্কায় বসবাস করছে তাদের কাউকে সাথে করে মদিনায় নিয়ে যাওয়া যাবে না। (৫) আরবের বিভিন্ন গোত্রগুলোর এ স্বাধীনতা থাকবে যে, তারা উভয় পক্ষের (মুসলমান ও কাফির) মাঝে যাদের সঙ্গে ইচ্ছা সংযোগ স্থাপন করতে পারবে (৬) সন্ধিচুক্তির মেয়াদের মধ্যে উভয় পক্ষ শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে যাতায়াতের সম্পর্ক চালু রাখতে পারবে। এছাড়া কুরাইশ প্রতিনিধি সুহায়েল বিন আমর সন্ধিপত্র থেকে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' এবং 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বাক্য দুটি কেটে দেয়ার জন্য দাবি করেছিল। কিন্তু সন্ধিপত্রের লেখক হযরত আলী (রা.) তা মেনে নিতে রাজি হলেন না।

অবশেষে বিশ্বনবী (সা.) সুহায়েল বিন আমরের আপত্তির প্রেক্ষিতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম' এবং 'মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বাক্য দুটি নিজ হাতে কেটে দেন এবং এর পরিবর্তে সুহায়েল বিন আমরের দাবি অনুযায়ী 'বিছমিকা আল্লাহুম্মা' লিখতে নির্দেশ দেন। সুতরাং বাহ্যিক দৃষ্টিতে এ সন্ধি মুসলমানদের জন্য অপমানজনক হলেও তা মুহাম্মদ (সা.) কে অনেক সুযোগ ও সুবিধা ও সাফল্য এনে দিয়েছিল। এ সন্ধির মাধ্যমে কুরাইশরা মুহাম্মদ (সা.)-এর রাজনৈতিক সত্তাকে একটি স্বাধীন সত্তা হিসেবে স্বীকার করে নেয়। সন্ধির শর্তানুযায়ী অমুসলিমগণ মুসলমানদের সাথে অবাধে মেলামেশার সুযোগ পায়। ফলে অমুসলিমগণ ইসলামের মহৎ বাণী উপলব্ধি করতে থাকে এবং দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। এ সন্ধির পরই মুহাম্মদ (সা.) বিভিন্ন রাজন্যবর্গের নিকট ইসলামের দাওয়াত দিয়ে পত্র প্রেরণ করেন এবং অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করেন। মুহাম্মদ (সা.) যেখানে মাত্র ১৪০০ মুসলিম সৈন্য নিয়ে হুদায়বিয়াতে গিয়েছিলেন, সেখানে মাত্র ২ বছর অর্থাৎ অষ্টম হিজরিতে ১০,০০০ মুসলিম সৈন্য নিয়ে বিনা রক্তপাতে মক্কা জয় করেন। যে মক্কা থেকে বিশ্বনবী (সা.) নির্যাতিত অবস্থায় বিতাড়িত হয়েছিলেন, সেখানে আজ তিনি বিজয়ের বেশে উপস্থিত হলেন এবং মক্কাবাসীদের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেন। মক্কা বিজয়ের দিন হযরত ওরম ফারুক (রা.) কুরাইশ নেতা আবু সুফিয়ানকে গ্রেফতার করে মুহাম্মদ (সা.)-এর সম্মুখে উপস্থিত করেন। কিন্তু তিনি তাঁর দীর্ঘদিনের শত্রুকে হাতে পেয়েও ক্ষমা করে দেন। ক্ষমার এ মহান আদর্শ পৃথিবীর ইতিহাসে আজও বিরল। মক্কায় আজ ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীয়মান। সকল অন্যায়, অসত্য, শোষণ ও জুলুমের রাজত্ব চিরতরে বিলুপ্ত।

৬৩১ খ্রিষ্টাব্দ মোতাবেক দশ হিজরিতে মুহাম্মদ (সা.) লক্ষাধিক মুসলিম সৈন্য নিয়ে বিদায় হজ সম্পাদন করেন এবং হজ শেষে আরাফাতের বিশাল ময়দানে প্রায় ১,১৪,০০০ সাহাবির সম্মুখে জীবনের অন্তিম ভাষণ প্রদান করেন, যা ইসলামের ইতিহাসে 'বিদায় হজের ভাষণ' নামে পরিচিত। বিদায় হজের ভাষণে বিশ্বনবী (সা.) মানবাধিকার সম্পর্কিত যে সনদপত্র ঘোষণা করেন দুনিয়ার ইতিহাসে তা আজও অতুলনীয়। তিনি দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন (১) হে বন্ধুগণ, স্মরণ রেখ, আজিকার এ দিন, এ মাস এবং এ পবিত্র নগরী তোমাদের নিকট যেমন পবিত্র, তেমনি পবিত্র তোমাদের সকলের জীবন, তোমাদের ধন-সম্পদ, রক্ত এবং তোমাদের মান-মর্যাদা তোমাদের পরস্পরের নিকট। কখনো অন্যের ওপর অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করবে না (২) মনে রেখ, স্ত্রীদের ওপর তোমাদের যেমন অধিকার আছে, তোমাদের ওপরও স্ত্রীদের তেমন অধিকার আছে (৩) সাবধান, শ্রমিকের মাথার ঘাম শুকানোর পূর্বেই তার উপযুক্ত পারিশ্রমিক পরিশোধ করে দেবে (৪) মনে রেখে যে পেট ভরে খায় অথচ তার প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত থাকে সে প্রকৃত মুসলমান হতে পারে না (৫) চাকর-চাকরানিদের প্রতি নিষ্ঠুর হয়ো না। তোমরা যা খাবে, তাদের তাই খেতে দেবে, তোমরা যা পরিধান করবে, তাদের তাই (সমমূল্যের) পরিধান করতে দেবে। (৬) কোনো অবস্থাতেই ইয়াতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করবে না। এমনিভাবে মানবাধিকার সম্পর্কিত বহু বাণী তিনি বিশ্ববাসীর উদ্দেশে পেশ করে যান। তিনি হলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী, মানবজাতির একমাত্র আদর্শ এবং বিশ্ব জাহানের রহমত হিসেবে প্রেরিত।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর নবুয়্যতের ২৩ বছরের আন্দোলনে আরবের একটি অসভ্য ও বর্বর জাতিকে একটি সভ্য ও সুশৃঙ্খল জাতিতে পরিণত করেছিলেন। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে আমূল সংস্কার সাধন করেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চিরাচরিত গোত্রীয় পার্থক্য তুলে দিয়ে, তিনি ঘোষণা করেন, 'অনারবের ওপর আরবের এবং আরবের ওপর অনারবদের; কৃষ্ণাঙ্গের ওপর শ্বেতাঙ্গের এবং শ্বেতাঙ্গের ওপর কৃষ্ণাঙ্গের কোনো পার্থক্য নেই। বরং তোমাদের মধ্যে ওই ব্যক্তি উত্তম যে অধিক মুত্তাকিন।' অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি সুদকে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং জাকাতভিত্তিক অর্থনীতির মাধ্যমে এমন একটি অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যেখানে রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিক তাদের আর্থিক নিরাপত্তা লাভ করেছিল। সামাজিক

ক্ষেত্রে নারীর কোনো মর্যাদা ও অধিকার ছিল না। বিশ্বনবী (সা.) নারী জাতিকে সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করলেন এবং ঘোষণা করলেন 'মায়ের পদতলে সন্তানের বেহেশত।' নারী জাতিকে শুধুমাত্র মাতৃত্বের মর্যাদাই দেননি, উত্তরাধিকার ক্ষেত্রেও তাদের অধিকারকে করেছেন সমুন্নত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। ক্রীতদাস আযাদ করাকে তিনি উত্তম ইবাদত বলে ঘোষণা করেন। ধর্মীয় ক্ষেত্রে যেখানে মূর্তিপূজা, অগ্নিপূজা এবং বিভিন্ন বস্তুর পূজা আরববাসীদের জীবনকে কলুষিত করেছিল সেখানে তিনি আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠা করেন। মোদ্দা কথা তিনি এমন একটি অপরাধমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যেখানে কোনো হানাহানি, রাহাজানি, বিশৃঙ্খলা, শোষণ, জুলুম, অবিচার, ব্যভিচার, সুদ, ঘুষ ইত্যাদি ছিল না।

অবশেষে এ মহামানব ১২ রবিউল আওয়াল, ১১ হিজরি মোতাবেক ৭ জুন, ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে ৬৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তিনি হলেন সর্বশেষ নবী ও রাসূল। পৃথিবীর বুকে কিয়ামত পর্যন্ত আর কোনো নবীর আবির্ভাব হবে না। বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) গোটা মুসলিম জাতিকে উদ্দেশ করে বলে গিয়েছেন, 'আমি তোমাদের জন্য দুটি জিনিস রেখে গেলাম। যত দিন তোমরা এ দুটি জিনিসকে আঁকড়ে রাখবে তত দিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি হলো আল্লাহর কিতাব অর্থাৎ কোরআন আর অপরটি হলো আমার সুন্নাহ অর্থাৎ হাদিস।' বিশ্বনবী (সা.) এর জীবনী লিখতে গিয়ে খ্রিষ্টান লেখক ঐতিহাসিক উইলিয়াম মুর বলেছেন, 'He was the mater mind not only of his own age but of all ages' অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.) যে যুগে পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাকে শুধু সে যুগেরই একজন মনীষী বলা হবে না, বরং তিনি ছিলেন সর্বকালের, সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী।

শুধুমাত্র ঐতিহাসিক উইলিয়াম মুরই নন, পৃথিবীর বুকে যত মনীষীর আবির্ভাব ঘটেছে প্রায় প্রত্যেকেই বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্পর্কে তাঁদের মূল্যবান বাণী পৃথিবীর বুকে রেখে গেছেন। পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, 'তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূল হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।' (সূরা-আহযাব, আয়াত-২১)।

বর্তমানে অশান্ত, বিশৃঙ্খল ও দ্বন্দ্বমুখর আধুনিক বিশ্বে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আদর্শকে অনুসরণ করা হলে বিশ্বে শান্তি ও একটি অপরাধমুক্ত সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা নিঃসন্দেহে সম্ভব

ইমাম আবু হানিফা (র.)

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ১০০ মনীষীর জীবনী থেকে

অধঃপতনের যুগে জ্ঞানের আলোকবর্তিকা নিয়ে যে সকল মনীষী পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন, পার্থিব লোভ-লালসা ও ক্ষমতার মোহ যাদের ন্যায় ও সত্যের আদর্শ থেকে বিন্দুমাত্র পদস্খলন ঘটাতে পারেনি; যারা অন্যায় ও অসত্যের নিকট কোনো দিন মাথা নত করেননি, ইসলাম ও মানুষের কল্যাণে সারাটা জীবন যারা পরিশ্রম করে গিয়েছেন, সত্যকে আঁকড়ে থাকার কারণে যারা জালেম সরকার কর্তৃক অত্যাচারিত, নিপীড়িত, নির্যাতিত; এমনকি কারাগারে নির্মমভাবে প্রহৃত হয়েছেন, ইমাম আবু হানিফা (র.) তাঁদের অন্যতম।

উমাইয়া খলিফাগণের দুঃশাসন, কুশাসন ও স্বৈরাচারী কার্যকলাপে সমগ্র মুসলিম জাহান আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। তাদের দ্বারা এমন সব জঘন্য কাজ সম্পাদিত হয়েছিল যা বিশ্ব ইতিহাসে বিরল। তাদের নিষ্ঠুর কার্যকলাপ কেবল নাগরিকদের ধন-সম্পদ ও জীবনের ওপর দিয়েই প্রবাহিত হয়নি, নারী জাতির মান-সমমান ও সতীত্বও ধূলায় ধূসরিত হয়ে গিয়েছিল। মহানবীর আদর্শ ও খোলাফায়ে রাশেদীনের রাষ্ট্রব্যবস্থাকে শুধু ভুলুণ্ঠিতই করা হয়নি; চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা.)-এর নামে রীতিমতো জুমার নামাজে

প্রকাশ্য মিম্বরে দাঁড়িয়ে অভিশাপ বর্ষণ করা হতো। খিলাফতের স্থান দখল করেছিল রাজতন্ত্র। অত্যাচারের মূর্ত প্রতীক, যুগের অভিশাপ ও কলঙ্ক ইয়াযিদ ইবনে যিয়াদ ও হাজ্জাজ বিন ইউসুফের নিষ্ঠুর তরবারির আঘাতে সামান্য কথার জন্য হাজার হাজার মুসলমানের মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল। লৌহদণ্ডের প্রতাপে উমাইয়া বংশীয় খলিফাগণ এমন সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল যেখানে কোনো প্রতিবাদ তো দূরের কথা কোনো প্রকার সংশোধনের কথা মুখে উচ্চারণ করাই ছিল নিজের মৃত্যু ডেকে আনা। তরবারির ভয় দেখিয়ে সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার সমস্ত পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। এক কথায় উমাইয়া বংশীয় শাসকগণ ও তাদের বর্বর গভর্নরগণ মুসলিম জাহানে নিষ্ঠুরতার এমন এক নজির স্থাপন করেছিল যা পৃথিবীর ইতিহাসে আজও বিরল।

ঠিক এমনি এক যুগসন্ধিক্ষণে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ইসলামের বিবেকী কণ্ঠ ও অন্যায়ের প্রতিবাদী ইমাম আবু হানিফা (র.)। উল্লেখ্য যে উমাইয়া বংশীয় খলিফাগণের মধ্যে কেবল ওয়ালিদ এবং খলিফা ওমর বিন আবদুল আজিজ (র.) এর শাসনকালই ছিল ইসলাম ও ব্যক্তি স্বাধীনতার স্বর্ণযুগ।

ইমাম আবু হানিফা (র.) ৮০ হিজরি মোতাবেক ৭০২ খ্রিষ্টাব্দে কুফা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম হলো নু'মান। পিতার নাম ছাবিত এবং পিতামহের নাম জওতা। তাঁর বাল্যকালের ডাক নাম ছিল আবু হানিফা। তিনি ইমাম আজম নামেও সর্বাধিক পরিচিত। তাঁর পূর্বপুরুষগণ ইরানের অধিবাসী ছিলেন। পিতামহ জওতা জন্মভূমি পরিত্যাগ করে তৎকালীন আরবের সমৃদ্ধিশালী নগর কুফায় এসে বাসস্থান নির্মাণ করে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ইমাম আবু হানিফা (র.) বাল্যকালে লেখাপড়ার কোনো সুযোগ পাননি। কারণ তখন কুফায় মারওয়ানী খিলাফতের যুগ। আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ান ছিলেন খিলাফতের প্রধান এবং যুগের অভিশাপ, নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ছিলেন ইরাকের শাসনকর্তা। দেশের ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো প্রায় বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। ইমাম আবু হানিফা (র.) ১৪-১৫ বছর বয়সে একদিন যখন বাজারে যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে তৎকালীন বিখ্যাত ইমাম হযরত শা'বী (র.) তাঁকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, হে বালক, তুমি কি কোথাও লেখাপড়া শিখতে যাচ্ছ? উত্তরে তিনি অতি দুঃখিত স্বরে বললেন, 'আমি কোথাও লেখাপড়া শিখি না।' ইমাম শা'বী (র.) বললেন, 'আমি যেন তোমার মধ্যে প্রতিভার চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি। ভালো আলেমের নিকট তোমার লেখাপড়া শেখা উচিত।'

ইমাম শা'বী (র.)-এর উপদেশ ও অনুপ্রেরণায় ইমাম আবু হানিফা (র.) ইমাম হামমাদ (র.) ইমাম আতা ইবনে রবিয়া (র.) ও ইমাম জাফর সাদিক (র.)-এর মতো তৎকালীন বিখ্যাত আলেমগণের নিকট শিক্ষা লাভ করেন এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যেই কোরআন, হাদিস, ফিকাহ, ইলমে কালাম, আদব প্রভৃতি বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। জ্ঞান লাভের জন্য তিনি মক্কা, মদিনা, বসরা এবং কুফার বিভিন্ন এলাকায় অবস্থানরত আলেমগণের নিকট পাগলের ন্যায় ছুটে গিয়েছিলেন। বিভিন্ন স্থান থেকে হাদিসের অমূল্য রত্ন সংগ্রহ করে স্বীয় জ্ঞানভান্ডার পূর্ণ করেন। উল্লেখ্য যে, তিনি চার সহস্রাধিক আলেমের নিকট শিক্ষা লাভ করেছিলেন। ইমাম মালেক (র.)-এর নিকটও তিনি হাদিস শিক্ষা লাভ করেন। ইমাম মালেক (র.) যদিও বয়সের দিক থেকে তাঁর চেয়ে ১৩ বছরের ছোট ছিলেন; তথাপি ইমাম আবু হানিফা (র.) তাঁকে অশেষ সমমান করতেন এবং ইমাম মালেক (র.) ও ইমাম আবু হানিফা (র.) কে শিক্ষকের ন্যায় সমমান দেখাতেন। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের আদব-কায়দা এমনই হয়ে থাকে। শিক্ষকগণের প্রতি ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর এত ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল যে তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন, 'আমার শিক্ষক ইমাম হামমাদ (র.) যত দিন জীবিত ছিলেন তত দিন আমি তাঁর বাড়ির দিকে পা মেলে বসিনি। তার কারণ, আমার ভয় হতো শিক্ষকের প্রতি আমার বেয়াদবি হয়ে যায় কি না।'

কারো কারো মতে, ইমাম আবু হানিফা (র.) তাবেয়ী ছিলেন। সাহাবাগণের যুগ তখন প্রায় শেষ হলেও কয়েকজন সাহাবি জীবিত ছিলেন। ১০২ হিজরিতে তিনি যখন মদিনা গমন করেন তখন মদিনায় দুজন সাহাবি হযরত সোলাইমান (রা.) ও হযরত সালেম ইবনে সুলাইমান (রা.) জীবিত ছিলেন এবং ইমাম আবু হানিফা (র.) তাঁদের দর্শন লাভ করেন। কিন্তু অনেকের মতে, তিনি কোনো সাহাবির দর্শন পাননি। তবে তাবে, তাবে তাবেয়ী হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতবিরোধ নেই। ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর শিক্ষকগণ প্রায় সবাই ছিলেন তাবেয়ী। ফলে হাদিস সংগ্রহের ব্যাপারে তাঁদের মাত্র একটি মধ্যস্থতা অবলম্বন করতে হতো। তাই তাঁর সংগৃহীত হাদিসসমূহ সম্পূর্ণ ছহীহ বলে প্রমাণিত হয়েছে।

তাফসির ও হাদিসশাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ অভিজ্ঞতা ও পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও ফিকাহশাস্ত্রেই তিনি সর্বাধিক খ্যাতি লাভ করেছেন। তিনি কোরআন, হাদিস, ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিতে বিবিধ বিষয়ে ইসলামি আইনগুলোকে ব্যাপক ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আলোচনা করেছেন। বর্তমান বিশ্বের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ মুসলমান হানাফি মাজহাবের অনুসারী। ফিকাহশাস্ত্রে তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও অবদানের জন্যই মুসলিম জাতি সত্যের সন্ধান অনায়াসে লাভ করতে পেরেছে। ফিকাহশাস্ত্রের উন্নতির জন্য তিনি ৪০ সদস্যবিশিষ্ট একটি সমিতি গঠন করেন। ইমাম আবু হানিফা (র.) ছিলেন সমিতির প্রধান। সমিতির সদস্যদের মধ্যে ইমাম জাফর সাদিক, হাব্বান, ইমাম মুহামমদ ইউসুফ, ইয়াহ ইয়া ইবনে আবি জায়েদা, ইমাম মুহামমদ, ইউসুফ ইবনে খালেদের নাম উল্লেখযোগ্য। ইসলামের বিভিন্ন আইন নিয়ে সমিতিতে স্বাধীনভাবে আলোচনা হতো। প্রত্যেকেই কোরআন ও হাদিসের ভিত্তিতে নিজ নিজ মতামত ব্যক্ত করতেন। অতঃপর সর্বসমমতিক্রমে সঠিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হতো এবং তা লিপিবদ্ধ করা হতো। সুদীর্ঘ ৩০ বছর কাল ইমাম আবু হানিফা (র.) ও অন্যদের আপ্রাণ চেষ্টা ও সাধনার ফলে ফিকাহশাস্ত্রের উন্নতি সাধিত হয়। তিনি তাঁর শিক্ষকতা জীবনে পৃথিবীতে হাজার হাজার মুফাচ্ছির, মুহাদ্দিস ও ফকীহ তৈরি করে গিয়েছেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে যারা ইসলামের ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন তাঁদের মধ্যে ইমাম মুহামমদ (র.), ইমাম আবু ইউসুফ (র.) ও ইমাম যুফার (র.) অন্যতম।

ইমাম আবু হানিফার (র.) চরিত্র ছিল বহু গুণে গুণান্বিত। তিনি ছিলেন আত্মসংযমী, মহান চরিত্রবান, পরহেজগার, উদার, দানশীল, অতিশয় বিচক্ষণ এবং মুত্তাক্কিন। তিনি ছিলেন হিংসা, লোভ, ক্রোধ, পরনিন্দা ইত্যাদি থেকে পবিত্র। বিনা প্রয়োজনে কোনো কথা বলতেন না। তিনি সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর পর্যন্ত এশার নামাজের ওজু দিয়ে ফজরের নামাজ আদায় করেছেন। এতে এটাই বোঝা যায় যে, তিনি সারারাত আল্লাহর ইবাদত, ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণায় মগ্ন থাকতেন। কতিপয় কর্মচারীর দ্বারা ব্যবসা পরিচালনা করতেন। ব্যবসায় যাতে হারাম অর্থ উপার্জিত না হয় সে জন্য তিনি কর্মচারীদের সব সময় সতর্ক করতেন। একবার তিনি দোকানে কর্মচারীদের কিছু কাপড়ের দোষ-ত্রুটি দেখিয়ে বললেন, 'ক্রেতার নিকট যখন এগুলো বিক্রি করবে তখন কাপড়ের এ দোষগুলো দেখিয়ে দেবে এবং এর মূল্য কম রাখবে।' কিন্তু পরবর্তী কর্মচারীগণ ভুলক্রমে ক্রেতাকে কাপড়ের দোষত্রুটি না দেখিয়েই বিক্রি করে দেন। এ কথা তিনি শুনতে পেরে খুব ব্যথিত হয়ে কর্মচারীদের তিরস্কার করেন এবং বিক্রীত কাপড়ের সমুদয় অর্থ সদকা করে দেন। তাঁর সততার এ রকম শত শত ঘটনা রয়েছে।

তিনি কখনো সরকারি কোনো অনুদান গ্রহণ করেননি। নিজের ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতাকে ঊর্ধ্বে স্থান দিতেন তিনি। উমাইয়া বংশীয় খলিফাদের অত্যাচার, নিষ্ঠুরতা ও অমানবিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আস্তে আস্তে সারা দেশে তীব্র আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে মারওয়ানের শাসনামলে আব্বাসীয় খিলাফতের দাবিদারদের আন্দোলন ছিল তুঙ্গে। এ আন্দোলন সমগ্র ইরাক ও কুফায় উমাইয়া বংশীয় খলিফা মারওয়ানের সিংহাসন কাঁপিয়ে তুলেছিল। ১২৯ হিজরি মারওয়ান তাঁর বিচক্ষণ আমলা ইয়াজিদ ইবনে ওমর ইবনে হুবায়রাকে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করেন। ইয়াজিদ ইবনে হুবায়রা শাসনকার্যে ধর্মীয় নেতাদের উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব

করলেন। তাই তিনি ক্ষমতা ও অর্থের লোভ দেখিয়ে ধর্মীয় নেতাদের শাসনকার্যে জড়িত করার চেষ্টা চালান এবং ইতিমধ্যে কয়েকজনকে বড় বড় রাজকীয় পদও দান করেন। তখন সমগ্র ইরাক ও কুফায় ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর সুনাম, সততা ও জনপ্রিয়তা ছিল সর্বাধিক। ইয়াজিদ ইবনে হুরায়রা ইমাম আবু হানিফা (র.) কে প্রধান বিচারপতির (কাজী) পদ গ্রহণ করার আমন্ত্রণ জানান। ইমাম আবু হানিফা (র.) বুঝতে পেরেছিলেন যে, এটা হলো উমাইয়া খিলাফতকে দীর্ঘায়িত করার একটি গভীর ষড়যন্ত্র। তিনি এটাও বুঝতে পেরেছিলেন যে, প্রাদেশিক জালিম গভর্নরদের অধীনে কাজীর পদ গ্রহণ করে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। বিচারকার্যে উমাইয়া শাসকগণ প্রভাব ফেলতে পারে। তাদের অধীনে কাজীর পদ গ্রহণ করার অর্থ হবে সত্য ও ন্যায়কে জলাঞ্জলি দিয়ে ক্ষমতা ও অর্থের মোহে উমাইয়া জালিম শাসকগোষ্ঠীর গোলামি করা। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, তিনি সরকারি কোনো সাহায্য গ্রহণ করতেন না এবং অবৈধ ক্ষমতা ও অর্থের লোভ-লালসা তাঁকে কোনো দিন সপর্শ করতে পারেনি। তাই সত্যকে প্রকাশ করতে তিনি কাউকে কখনো ভয় করতেন না। ইয়াজিদ ইবনে হুরায়রার আমন্ত্রণ পেয়ে শুধু প্রত্যাখ্যানই করলেন না বরং সুসপষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, 'প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণ করা তো দূরের কথা মোটা অঙ্কের বেতন দিয়ে ইয়াজিদ যদি মসজিদের দরজা জানালাগুলো গোনার মতো হালকা দায়িত্বও দেয় তথাপি এ জালেম সরকারের অধীনে আমি তা গ্রহণ করব না।' এতে ইয়াজিদ ক্ষিপ্ত হয়ে ইমাম আবু হানিফা (র.) কে গ্রেফতার করে কারাগারে বন্দি করেন। এরপর কারাগারে তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পদ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু এতেও তিনি রাজি না হওয়ায় কারাগারে প্রতিদিন তাঁকে বেত্রাঘাত করা হতো। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (র.) নির্যাতনের ভয়ে জালিম সরকারের নিকট মাথা নত করেননি। অবশষে কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি মক্কায় চলে আসেন।

১৩১ হিজরিতে উমাইয়া শাসনের অবসান ঘটলে আব্বাসীয় খিলাফতের সূচনা হয়। ইমাম আবু হানিফা (র.) মক্কা থেকে কুফায় ফিরে আসেন। আব্বাসীয়গণ ইতিপূর্বে আহলে বাইয়াতদের পক্ষে আন্দোলন করলেও, ক্ষমতা লাভের পর আহলে বাইয়াতদের প্রতি খড়গহস্ত হয়ে ওঠেন এবং ধর্মীয় নেতাদের প্রতি নিষ্ঠুর ও অমানবিক নির্যাতন চালাতে শুরু করেন। আব্বাসীয়গণ তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী উমাইয়া বংশীয়দের প্রায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিয়েছিল। এমন কি উমাইয়া খলিফাদের কবর খুঁড়ে তাঁদের অস্থি পাঁজর তুলে এনে জ্বালিয়ে ফেলেছিল। আব্বাসীয় বংশীয় খলিফা মনসুর সিংহাসনে বসে আহলে বাইয়াত ও আলেম সমাজের প্রতি অত্যাচারের স্টিম রোলার চালান।

১৪৫ হিজরিতে মুহামমদ নাফসে জাকিয়া খলিফা মনসুরের অনৈসলামিক ও অমানবিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং যুদ্ধে শহীদ হন। ইমাম মালেক (র.) ও ইমাম আবু হানিফা (র.)সহ প্রায় সকল ধর্মীয় নেতা মুহামমদ নাফসে জাকিয়ার পক্ষে ছিলেন। নাফসে জাকিয়া শহীদ হওয়ার পর তাঁর ভ্রাতা ইব্রাহীম বিদ্রোহের পতাকা স্বহস্তে তুলে নেন এবং তৎকালীন দীনদার মুসলমান ও আলেম সমাজ ইব্রাহীমের পতাকাতলে সমবেত হতে লাগলেন। জানা যায়, একমাত্র কুফা নগরেই বিশ লক্ষ মুসলমান মনসুরের বিরুদ্ধে মুহমমদ ইব্রাহীমের পক্ষে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছিল। ইমাম আবু হানিফা (র.) মুহামমদ ইব্রাহীমকে গোপনে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছিলেন এবং সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রচুর অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করেছিলেন। যুগের নিষ্ঠুর ও জালেম মনসুর গোপনে বহু উপঢৌকন পাঠিয়ে ইমাম আবু হানিফা (র.) কে হাত করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (র.) এগুলোকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। অবশেষে ১৪৬ হিজরিতে খলিফা মনসুর ইমাম আবু হানিফা (র.) কে বাগদাদে খলিফার দরবারে তলব করেন। তিনি খলিফার দরবারে উপস্থিত হলে তাঁকে প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণ করার অনুরোধ জানান। কিন্তু ইমাম আবু হানিফা (র.) জালেম সরকারের অধীনে এ পদ গ্রহণ করতে রাজি হলেন না। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে এটা মনসুরের গভীর ষড়যন্ত্র। এছাড়া এ পদ গ্রহণ করার অর্থ হবে ন্যায়, ইনসাফ ও ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দিয়ে জালেমের পূজারি করা। তাই ইমাম আবু

হানিফা (র.) খলিফা মনসুরকে বললেন, 'আমি প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণ করার যোগ্য নই।' এতে খলিফা রাগান্বিত স্বরে বললেন, আপনি মিথ্যাবাদী। প্রত্যুত্তরে ইমাম সাহেব বললেন, 'আপনার কথা যদি সত্যি হয় (অর্থাৎ আপনার কথানুযায়ী আমি যদি মিথ্যাবাদী হই) তাহলে আমার কথাই সঠিক। কারণ একজন মিথ্যাবাদী রাষ্ট্রের 'প্রধান বিচারপতি' পদের যোগ্য নয়।'

অতঃপর খলিফা মনসুর কোনো উত্তর দিতে না পেরে ক্রুদ্ধ হয়ে ইমাম আবু হানিফা (র.) কে গ্রেফতার করে কারাগারে বন্দি করার নির্দেশ দেন। কারাগারে বসেও ইমাম আবু হানিফা (র.) ফিকাহশাস্ত্রে তাঁর কঠোর সাধনা চালিয়েছিলেন। কারাগারে বসেই তিনি বিভিন্ন কঠিন মাসআলার জবাব দিতেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে শত শত মানুষ এসে কারাগারেই মাসআলা শিক্ষা লাভ করে যেতেন। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) লিখেছেন, ইমাম আবু হানিফা (র.) কেবল কারাগারে বসেই ১২ লাখ ৯০ হাজারের অধিক মাসআলা লিপিবদ্ধ করেছিলেন। এরপর খলিফা মনসুর একদিন খাদ্যের সাথে বিষ মিশিয়ে দেন। ইমাম আবু হানিফা (র.) বিষক্রিয়া বুঝতে পেরে সিজদায় পড়ে যান এবং সিজদা অবস্থায়ই তিনি ১৫০ হিজরিতে এ নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করেন। এ সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর।

ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর মৃত্যুর সংবাদ বিদ্যুতের গতিতে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং দেশের সর্বস্তরের লোকজন মৃত্যুর সংবাদ শুনে শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ে। কথিত আছে, তাঁর জানাজায় পঞ্চাশ হাজারের অধিক লোক অংশগ্রহণ করেছিল; কিন্তু লোকজন আসতে থাকায় ৬ বার তাঁর জানাজা পড়া হয়েছিল। তাঁর অসিয়ত অনুযায়ী বিজরান কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

হযরত মুসা (আ.)

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ১০০ মনীষীর জীবনী থেকে
(খ্রিষ্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতাব্দী)

প্রাচীন মিসরের রাজধানী ছিল পেন্টাটিউক। নীল নদের তীরে এই নগরে বাস করতেন মিসরের 'ফেরাউন' রামেসিস। নগরের শেষ প্রান্তে ইহুদিদের বসতি।

মিসরের 'ফেরাউন' ছিলেন ইহুদিদের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন। একবার কয়েকজন জ্যোতিষী গণনা করে তাকে বলেছিলেন, ইহুদি পরিবারের মধ্যে এমন এক সন্তান জন্মগ্রহণ করবে যে ভবিষ্যতে মিসরের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। জ্যোতিষীদের কথা শুনে ভীত হয়ে পড়লেন ফ্যারাও। তাই 'ফেরাউন' আদেশ দিলেন কোনো ইহুদি পরিবারে সন্তান জন্মগ্রহণ করলেই যেন তাকে হত্যা করা হয়।

ফেরাউনের গুপ্তচররা চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াত। যখনই কোনো পরিবারে সন্তান জন্মানোর সংবাদ পেত তখনই গিয়ে তাকে নির্মমভাবে হত্যা করত।

ইহুদি মহল্লায় বাস করতেন আসরাম আর জোশিবেদ নামে এক সদ্যবিবাহিত দম্পতি। যথাসময়ে জোশিবেদের একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করল। সন্তান জন্মানোর পরই স্বামী-স্ত্রীর মনে হলো যেমন করেই হোক এই সন্তানকে রক্ষা করতেই হবে। কে বলতে পারে এই সন্তানই হয়তো ইহুদি জাতিকে সমস্ত নির্যাতন থেকে রক্ষা করবে একদিন।

সকলের চোখের আড়ালে সম্পূর্ণ গোপনে শিশুসন্তানকে বড় করে তুলতে লাগলেন আসরাম আর জোশিবেদ। কিন্তু বেশিদিন এই সংবাদ গোপন রাখা গেল না। স্বামী-স্ত্রী বুঝতে পারলেন যেকোনো মুহূর্তে ফেরাউনের সৈনিকরা এসে তাদের সন্তানকে তুলে নিয়ে যাবে। ঈশ্বর আর ভাগ্যের হাতে শিশুকে সঁপে দিয়ে দুজন বেরিয়ে পড়লেন। নীল নদের তীরে এক নির্জন ঘাটে এসে শিশুকে শুইয়ে দিয়ে তারা বাড়ি ফিরে গেলেন।

সেই নদীর ঘাটে প্রতিদিন গোসল করতে আসত 'ফেরাউনের' কন্যা। ফুটফুটে সুন্দর একটা বাচ্চাকে একা পড়ে থাকতে দেখে তার মায়া হলো। তাকে তুলে নিয়ে এলো রাজপ্রাসাদে। তারপর সেই শিশুসন্তানকে নিজের সন্তানের মতো স্নেহ-ভালোবাসা দিয়ে মানুষ করে তুলতে লাগল। রাজকন্যা শিশুর নাম রাখল মুসা।

এ বিষয়ে আরেকটি কাহিনী প্রচলিত। মুসার মা জোশিবেদ জানতেন প্রতিদিন ফেরাউনের কন্যা সখীদের নিয়ে নদীতে স্নান করতে আসেন। একদিন ঘাটের কাছে পথের ধারে শিশু মুসাকে একটা ঝুড়িতে করে শুইয়ে রেখে দিলেন। নিজে গাছের আড়ালে লুকিয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পর রাজকুমারী সেই পথ দিয়ে স্নান করতে যাওয়ার সময় দেখতে পেল মুসাকে। পথের পাশে ফুটফুটে একটা শিশুকে পড়ে থাকতে দেখে তার মায়া হলো। তাড়াতাড়ি মুসাকে কোলে তুলে নিল। জোশিবেদকেই মুসার ধাত্রী হিসেবে নিয়োগ করে রাজকুমারী। নিজের পরিচয় গোপন করে রাজপ্রাসাদে মুসাকে দেখাশোনা করতে থাকে জোশিবেদ। মা ছাড়া মুসা কোনো নারীর স্তন্যপান করেনি।

ধীরে ধীরে কৈশোর থেকে যৌবনে পা দিলেন মুসা। ফ্যারাওয়ের অত্যাচার বেড়েই চলছিল। ইহুদির ওপর এই অত্যাচার ভালো লাগত না মুসার। পুত্রের মনোভাব জানতে পেরে একদিন জোশিবেদ তার কাছে নিজের প্রকৃত পরিচয় দিলেন। তারপর থেকে মুসার অন্তরে শুরু হলো নিদারুণ যন্ত্রণা।

একদিন রাজপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন মুসা। এমন সময় তার চোখে পড়ল এক হতভাগ্য ইহুদিকে নির্মমভাবে প্রহার করছে তার মিসরীয় মনিব। এই দৃশ্য দেখে আর স্থির থাকতে পারলেন না মুসা। তিনি সেই ইহুদিকে উদ্ধার করার জন্য নিজের হাতে তরবারি দিয়ে আঘাত করলেন মিসরীর মনিবকে। সেই আঘাতে মারা গেল মিসরীয় লোকটি। ইহুদি লোকটি চারদিকে এ কথা প্রকাশ করে দিল। গুপ্তচররা ফেরাউনকে গিয়ে সংবাদ দিতেই ক্রোধে ফেটে পড়লেন ফেরাউন। তিনি বুঝতে পারলেন রাজকন্যা মুসাকে মানুষ করলেও তার শরীরে বইছে ইহুদি রক্ত, তাই নিজের ধর্মের মানুষের ওপর অত্যাচার হতে দেখে মিসরীয়কে হত্যা করেছে। একে যদি মুক্ত রাখা যায় তবে বিপদ অবশ্যম্ভাবী্ল্ল। তখনই সৈনিকদের ডেকে হুকুম দিলেন, যেখান থেকে পার মুসাকে বন্দি করে নিয়ে এসো। ফেরাউনের আদেশের কথা শুনে আর বিলম্ব করলেন না মুসা। তৎক্ষণাৎ নগর ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়লেন।

দীর্ঘ পথশ্রমে মুসা ক্লান্ত, তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর চোখে পড়ল দূরে একটি কুয়ো। কুয়োর সামনে সাতটি মেয়ে তাদের ভেড়াকে পানি খাওয়াচ্ছিল। হঠাৎ একদল মেষপালক সেখানে এসে মেয়েদের কাছ থেকে জোর করে ভেড়াগুলোকে কেড়ে নিল। সাথে সাথে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করে দিল সাত বোন। তাদের চিৎকার শুনে ছুটে এলেন মুসা। তারপর মেষপালকদের কাছ থেকে সব কটা ভেড়া উদ্ধার করে মেয়েদের ফিরিয়ে দিলেন। মেয়েরা তাঁকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

সাত বোনের বাবার নাম ছিল রুয়েন। সাত বোন এসে মুসাকে ডেকে নিয়ে গেল তাদের বাড়িতে। তাঁর পরনের মূল্যবান পোশাক, সমভ্রমপূর্ণ ব্যবহার দেখে সকলেই মুগ্ধ হয়ে গেল। রুয়েন তার পরিচয় জিজ্ঞেস করতেই কোনো কথা গোপন করলেন না মুসা। অকপটে নিজের পরিচয় দিলেন। রুয়েন মুসার ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে তাকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিল। অল্প কিছুদিন পর এক মেয়ের সাথে তাঁর বিয়ে দিলেন রুয়েন।

সেই যাযাবর গোষ্ঠীর সাথে থাকতে থাকতে অল্প দিনেই মেষ চরানোর কাজ শিখে নিলেন মুসা। এক নতুন পরিবেশের সাথে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে মানিয়ে নিলেন। দেখতে দেখতে বেশ কয়েক বছর কেটে গেল।

ওদিকে মিসরের ইহুদিনের অবস্থা ক্রমশই দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। মিডিয়াতে পশুপালকের জীবন যাপন করলেও স্বজাতির কথা ভুলতে পারেননি মুসা। মাঝে মাঝেই তার সমস্ত অন্তর ব্যথিত হয়ে উঠত। একদিন মেষের পাল নিয়ে ঘুরতে ঘুরতে নির্জন পাহাড়ের প্রান্তে এসে পৌঁছলেন মুসা। সামনেই বেশ কিছু গাছপালা। হঠাৎ মুসা দেখলেন সেই গাছপালা পাহাড়ের মধ্যে থেকে এক আলোকছটা বেরিয়ে এলো। এত তীব্র সেই আলো, মনে হলো দু চোখ যেন ঝলসে যাচ্ছে। তবুও স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন সেই আলোর দিকে। তার মনে হলো ওই আলো যেন তাঁকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। এক সময় শুনতে পেলেন সেই আলোর মধ্য থেকে এক অলৌকিক কণ্ঠস্বর ভেসে এলোঃ মুসা মুসা।

চমকে উঠলেন মুসা। কেউ তাঁরই নাম ধরে ডাকছে। তৎক্ষণাৎ সাড়া দিলেন, কে আপনি আমায় ডাকছেন? সেই অলৌকিক কণ্ঠস্বর বলে উঠল, আমি তোমার ও তোমার পূর্বপুরুষদের একমাত্র ঈশ্বর।

ঈশ্বর তাঁর সাথে কথা বলছেন, এ যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না মুসা। ভীত হয়ে মাটিতে নতজানু হয়ে বসে পড়লেন। আমার কাছে আপনার কী প্রয়োজন প্রভু? দৈব কণ্ঠস্বর বলল, তুমি আমার প্রতিনিধি হিসেবে মিসরে যাও। সেখানে ইহুদিরা অমানুষিক নির্যাতন ভোগ করছে। তুমি ইহুদিদের মুক্ত করে নতুন দেশে নিয়ে যাবে। মুসা বললেন, আমি কেমন করে তাদের মুক্তি দেব? দৈববাণী বলল, আমি অদৃশ্যভাবে তোমাকে সাহায্য করব। তুমি ফ্যারাওয়ের কাছে গিয়ে বলবে, আমিই তোমাকে প্রেরণ করেছি। সকলেই যেন তোমার আদেশ মেনে চলে। মুসা বললেন, কিন্তু যখন তারা জিজ্ঞেস করবে ঈশ্বরের নাম, তখন কী জবাব দেব? প্রথমে ঈশ্বর তাঁর নাম প্রকাশ না করলেও পরে বললেন তিনিই এই বিশ্বজগতের স্রষ্টা আল্লাহ।

মুসা অনুভব করলেন তাঁর নিজের শক্তিতে নয়, ঈশ্বর প্রদত্ত শক্তিতেই তাঁকে সমস্ত কাজ সমাধান করতে হবে। এত দিন ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁর কোনো সপষ্ট ধারণা ছিল না। এই প্রথম অনুভব করলেন ঈশ্বর-নির্দিষ্ট কাজের জন্যই তিনি পৃথিবীতে এসেছেন। আর আল্লাহ তাঁর একমাত্র ঈশ্বর।

এর কয়েক দিন পর দ্বিতীয়বার ঈশ্বরের আদেশ পেলেন মুসা। তিনি পুনরায় আবির্ভূত হলেন মুসার সামনে। তারপর বললেন, তোমার ওপর আমি প্রসন্ন হয়েছি। একমাত্র তুমিই পারবে ইহুদি জাতিকে এই সংকট থেকে উদ্ধার করতে। আর বিলম্ব করো না, যত শিগগির সম্ভব রওনা হও মিসরে। অল্প কয়েক দিন পর স্ত্রী-সন্তানদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মিসরের পথে যাত্রা করলেন মুসা।

যথাসময়ে মিসরে গিয়ে পৌছালেন মুসা। গিয়ে দেখলেন সত্যি সত্যিই ইহুদিরা অবর্ণনীয় দুরবস্থার মধ্যে বাস কল্পরছে। মুসা প্রথমেই সাক্ষাৎ করলেন ইহুদিনের প্রধান নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সাথে। তাদের সকলকে বললেন ঈশ্বরের আদেশের কথা। মুসার আচার-আচরণ, তাঁর ব্যক্তিত্ব, আন্তরিক ব্যবহার, গভীর আত্মপ্রত্যয় দেখে সকলেই তাঁকে বিশ্বাস করল।

মুসা বললেন, আমরা ফেরাউনের কাছে গিয়ে দেশত্যাগ করার অনুমতি প্রার্থনা করব। মুসা তার ভাই অ্যারন ও কয়েকজন ইহুদি নেতাকে সাথে নিয়ে গিয়ে হাজির হলেন ফেরাউনের দরবারে। মুসা জানতেন সরাসরি দেশত্যাগের অনুমতি চাইলে কখনোই ফ্যারাও সেই অনুমতি দেবেন না। তাই তিনি বললেন, সম্রাট, আমাদের স্রষ্টা আদেশ দিয়েছেন সমস্ত ইহুদিকে মিডিয়ার মরুপ্রান্তরে এক পাহাড়ে গিয়ে প্রার্থনা করতে। আপনি যদি কয়েক দিনের জন্য সেখানে যাওয়ার অনুমতি দেন।

ফেরাউন মুসার অনুরোধে সাড়া দিলেন না। ক্রুদ্ধ স্বরে বলে উঠলেন, তোমাদের আল্লাহর আদেশ আমি মানি না। তোমরা মিসর ত্যাগ করে কোথাও যেতে পারবে না।

মুসা বললেন, আমরা যদি মরুভূমিতে গিয়ে প্রার্থনা না করি তবে তিনি আমাদের ওপর ক্রুদ্ধ হবেন। হয়তো আমাদের সকলকেই ধ্বংস করে ফেলবেন। ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এলেন মুসা। কী করবেন কিছুই ভাবতে পারছিলেন না। শেষে নিরুপায় হয়ে আল্লাহর কাছে আকুল হয়ে প্রার্থনা করলেন। তার প্রার্থনায় সাড়া দিলেন আল্লাহ। তিনি মুসাকে বললেন, তোমার ভাই অ্যারনকে বল, সে যেন নদী, জলাশয়, পুকুর ঝর্ণায় গিয়ে তার জাদুদণ্ড স্পর্শ করে, তাহলেই দেখবে সমস্ত পানি রক্ত হয়ে গেছে।

আল্লাহর নির্দেশে অ্যারন মিসরের সমস্ত পানীয় জলকে রক্তে রূপান্তরিত করে ফেলল। ফ্যারাও আদেশ দিলেন মাটি খুঁড়ে পানি বের করতে। সৈনিকরা অসংখ্য কূপ খুঁড়ে ফেলল। সকলে সেই জল পান করতে আরম্ভ করল। অ্যারনের জাদু বিফল হতেই মুসা পুনরায় আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন। এবার মিসর জুড়ে ব্যাঙের মহামারী দেখা গেল। তার পচা গন্ধে লোকের প্রাণান্ত অবস্থা। কেউ আর ঘরে থাকতে পারে না। সকলে গিয়ে ফেরাউনের কাছে নালিশ জানাল। নিরুপায় হয়ে ফেরাউন ডেকে পাঠালেন মুসাকে। বললেন, তুমি ব্যাঙের মড়ক বন্ধ কর। আমি তোমাদের মরুভূমিতে গিয়ে প্রার্থনা করার অনুমতি দেব। মুসার ইচ্ছায় ব্যাঙের মড়ক বন্ধ হলেও ফ্যারাও নানা অজুহাতে ইহুদিদের যাওয়ার অনুমতি দিলেন না। নিরুপায় হয়ে মুসা আবার আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন।

ফ্যারাওয়ের আচরণে এবার ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন আল্লাহ। সমস্ত মিসর জুড়ে শুরু হলো ঝড়-ঝঞ্ঝা, বৃষ্টি, মহামারী। তবুও ফেরাউন অনুমতি দিতে চায় না। এবার আল্লাহ নির্মম অস্ত্র প্রয়োগ করলেন। হঠাৎ সমস্ত মিসরীর প্রথম পুত্রসন্তান মারা পড়ল। দেশজুড়ে শুরু হলো হাহাকার। সমস্ত মিসরীয় দলবদ্ধভাবে গিয়ে ফেরাউনের কাছে দাবি জানাল, ইহুদিদের দেশ ছাড়ার অনুমতি দিন, না হলে আরো কী গুরুতর সর্বনাশ হবে কে জানে।

ভয় পেয়ে গেলেন ফ্যারাও। ফেরাউন মুসাকে ডেকে বললেন, প্রার্থনা করার জন্য তোমাদের মরুভূমিতে যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছি। যদি মনে কর, তোমাদের যা কিছু আছে, গৃহপালিত গবাদি পশু, জীবজন্তু, জিনিসপত্র, সব সাথে নিয়ে যেতে পার। দেশত্যাগের অনুমতি পেয়ে ইহুদিরা সকলেই উল্লসিত হয়ে উঠল। তারা সকলেই মুসাকে তাদের নেতা বলে স্বীকার করে নিল। মিসর ছাড়াও মাকুম নগরেও বহু ইহুদি বাস করত। সকলে দলবদ্ধভাবে মুসাকে অনুসরণ করল। মুসা জানতেন আল্লাহর শাস্তির ভয়ে ফ্যারাও দেশত্যাগের অনুমতি দিলেও তিনি শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করবেন যাতে তাদের যাত্রাপথে বিঘ্ন সৃষ্টি করা হয়। তাই যথাসম্ভব সতর্কভাবে পথ চলতে লাগলেন।

কয়েক দিন চলার পর তারা সকলে এসে পড়ল লোহিত সাগরের তীরে। এদিকে ইহুদিরা মিসর ত্যাগ করতেই ফেরাউনের মনের পরিবর্তন ঘটল। যেমন করেই হোক তাদের ফিরিয়ে নিয়ে এসে আবার ক্রীতদাসে পরিণত করতে হবে। তৎক্ষণাৎ ইহুদিদের বন্দি করার জন্য বিশাল এক সৈন্যবাহিনীকে পাঠালেন ফেরাউন।

এদিকে দূর থেকে মিসরীয় সৈন্যদের দেখতে পেয়ে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ল সমস্ত ইহুদি। সামান্যতম বিচলিত হলেন না মুসা। প্রার্থনায় বসলেন মুসা। প্রার্থনা শেষ হতেই দৈববাণী হলো, মুসা, তোমার হাতের দণ্ড তুলে সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে যাবে। সমুদ্রের পানি তোমাদের স্পর্শ করবে না।

মুসা তাঁর হাতের দণ্ড তুলে সমুদ্রের সামনে এসে দাঁড়াতেই সমুদ্র দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল। তার মধ্য দিয়ে প্রসারিত হয়েছে প্রশস্ত পথ। সকলের আগে মুসা, তার পেছনে সমস্ত ইহুদি নারী-পুরুষের দল সেই পথ ধরে এগিয়ে চলল। তারা কিছুদূর যেতেই মিসরীয় সৈন্যরা এসে পড়ল সমুদ্রের তীরে। ইহুদিদের সমুদ্রের মাঝখান দিয়ে যেতে দেখে তারাও তাদের অনুসরণ করে সেই পথ ধরে

এগিয়ে চলল। সমস্ত মিসরীয় বাহিনী সমুদ্রের মধ্যে নেমে আসতেই আল্লাহর নির্দেশ শুনতে পেলেন মুসা, তোমার হাতের দণ্ড পেছন ফিরে নামিয়ে দাও।

মুসা তাঁর হাতের দণ্ড নিচু করতেই সমুদ্রের জলরাশি এসে আছড়ে পড়ল মিসরীয় সৈন্যদের ওপর। মুহূর্তে বিশাল সৈন্যবাহিনী সমুদ্রের অতল গহরে হারিয়ে গেল। ইহুদিরা নিরাপদে তীরে গিয়ে উঠল। মুসা সকলকে নিয়ে এগিয়ে চললেন। সামনে বিশাল মরুভূমি। সামান্য পথ অতিক্রম করতেই তাদের সঞ্চিত পানি, খাবার ফুরিয়ে গেল। মরুভূমির বুকে কোথাও পানির চিহ্নমাত্র নেই। ক্রমশই সকলে তৃষ্ণার্ত, ক্ষুধার্ত হয়ে পড়ছিল। অনেকে আর অগ্রসর হতে চাইছিল না।

মুসা বিচলিত হয়ে পড়লেন, এতগুলো মানুষকে কোথা থেকে তৃষ্ণার পানি দেবেন। কিছুদূর যেতেই এক জায়গায় পানি পাওয়া গেল। এত দুর্গন্ধ সেই পানি, কার সাধ্য তা মুখে দেয়। প্রার্থনায় বসলেন মুসা। প্রার্থনা শেষ করে আল্লাহর নির্দেশে কিছু গাছের পাতা ফেলে দিলেন সেই পানির মধ্যে। সাথে সাথে সেই পানি সুস্বাদু পানীয় হয়ে উঠল। সকলে তৃষ্ণা মিটিয়ে সব পাত্র ভরে নিল। যারা মুসাকে দোষারোপ করছিল, তারা অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা চাইল। সকলে মুসাকে তাদের ধর্মগুরু ও নেতা হিসেবে স্বীকার করে নিল। সকলে তাঁর নির্দেশমতো এগিয়ে চলল। কিছুদিনের মধ্যেই সমস্ত খাবার ফুরিয়ে গেল। আশপাশে কোথাও কোনো খাবারের সন্ধান পাওয়া গেল না। খিদের তাড়নায় সকলেই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। আবার তারা দোষারোপ করতে আরম্ভ করল মুসাকে। তোমার জন্যই আমাদের এত কষ্ট সহ্য করতে হচ্ছে।

মুসা সকলকে শান্ত করে বললেন, তোমরা ভুলে গিয়েছ আমাদের ঈশ্বর আল্লাহর কথা। তিনি ফেরাউনকে তোমাদের দেশত্যাগের অনুমতি দিতে বাধ্য করেছেন। তিনি সমুদ্রকে দ্বিধাবিভক্ত করেছেন, সৈন্যদের হাত থেকে তোমাদের রক্ষা করেছেন। তোমাদের পানির ব্যবস্থা করেছেন। তবুও তোমরা তাঁর শক্তিতে সন্দেহ প্রকাশ করছে। মুসার কথা শেষ হতেই কোথা থেকে সেখানে উড়ে আসে অসংখ্য পাখির ঝাঁক। ইহুদিরা ইচ্ছামতো পাখি মেরে মাংস খায়। আর কারো মনে কোনো সংশয় থাকে না। মুসাই তাদের অবিসংবাদিত নেতা। সকলে শপথ করে জীবনে মরণে তারা মুসার সমস্ত আদেশ মেনে চলবে।

মুসা সমস্ত ইহুদিকে নিয়ে এলেন এফিডিম নামে এক নির্জন প্রান্তে। চারদিকে ধু ধু বালি, মাঝে মাঝে ছোট পাহাড়, কোথাও পানির কোনো উৎস নেই। মুসা আবার এগিয়ে চললেন। কিছুদূর গিয়ে একটা বড় পাহাড়ের সামনে এসে দাঁড়ালেন। আল্লাহর নির্দেশে একটা পাথর সরাতেই বেরিয়ে এলো স্বচ্ছ পানির এক ঝর্ণাধারা। সেই পানিতে সকলের তৃষ্ণা মিটল। মুসা যেখানে এসেছিলেন তার অদূরেই প্যালেস্টাইনে তখন বাস করত আমালেক নামে এক উপজাতি সম্প্রদায়। নতুন একদল মানুষকে তাদের অঞ্চলে প্রবেশ করতে দেখে তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলো।

অপরদিকে ইহুদিরা দীর্ঘ পথশ্রমে ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত, অবসন্ন, সকলে মুসাকে বলল, এই যুদ্ধে আমাদের নিশ্চিত পরাজয় হবে। তুমি অন্য কোথাও আশ্রয়ের সন্ধানে চল। মুসা সকলকে সাহস দিয়ে তাঁর দলের সমস্ত পুরুষদের একত্র করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। যুদ্ধ পরিচালনার ভার দেয়া হলো জোশুয়া নামে এক সাহসী যুবককে। শুরু হয়ে গেল তুমুল যুদ্ধ। মুসা নিজে যুদ্ধে যোগ দিলেন। আল্লাহর নির্দেশে পাহাড়ের ওপর উঠে তার হাতের দণ্ড আকাশের দিকে তুলে ধরলেন। যুদ্ধের প্রথমে আমালেকরা ইহুদিদের বিপর্যস্ত করছিল। কিন্তু মুসা তাঁর দণ্ড ঊর্ধ্বাকাশে তুলে ধরতেই যুদ্ধের গতি পরিবর্তন হলো। ইহুদিরা বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমালেকদের ওপর। ইহুদিদের সেই প্রচণ্ড বিক্রম সহ্য করতে পারল না আমালেকরা। বিপর্যস্ত বিধ্বস্ত হয়ে তারা পালিয়ে গেল। ইহুদিরা নতুন উদ্যমে এগিয়ে চলল প্যালেস্টাইনের দিকে। পথে সিনাই পর্বত। এখানে পানি ও গাছপালার কোনো অভাব নেই দেখে মুসা সেখানেই সকলকে তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দিলেন। সেই সময় মুসার শ্বশুর জেথ্রো তার স্ত্রী, দুই পুত্র, সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে সেই

পথ ধরে যাচ্ছিল। কাছে আসতেই বুঝতে পারলেন এরা দেশত্যাগী ইহুদি জাতি। তার জামাইয়ের নেতৃত্বে এখানে বসতি স্থাপন করেছে। জেথ্রো ছিলেন উপজাতি সম্প্রদায়ের পুরোহিত। নানা দেশদেবীর পূজা করতেন তিনি। মুসাকে বললেন, তোমাদের আল্লাহর কথা শুনে উপলব্ধি করতে পেরেছি, তিনি সকল দেবতার ঊর্ধ্বে, তিনিই সমস্ত শক্তির উৎস। এত দিন আমি ভুল পথে চালিত হয়েছি। যেসব দেবতাকে পূজা-অর্চনা করেছি তারা কেউই আল্লাহর সমকক্ষ নন। আমি তার ইবাদত করতে চাই।

মুসা ইহুদিদের মধ্যে থেকে সৎ ন্যায়বান জ্ঞানী মানুষদের বিচারক হিসাবে নিযুক্ত করলেন। এই সময় মুসা একদিন গভীর রাতে আল্লাহর দৈববাণী শুনতে পেলেন মুসা ঃ আমি আমার এক দূতকে তোমাদের কাছে পাঠাব। তোমরা সকলে তাঁকে অনুসরণ করবে। যে পথে তোমরা যাবে সেই পথে নানা বাধা আসবে। শত্রুরা তোমাদের যাত্রাপথে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। কিন্তু আমার আশীর্বাদে তোমাদের কোনো ক্ষতি হবে না। তুমি বীরদর্পে এগিয়ে যাবে। পথে অন্য কোনো দেবতার মূর্তি বিগ্রহ মন্দির দেখলেই তা ধ্বংস করবে। আর সর্বত্র আমার উপদেশ প্রচার করবে। যারা মূর্তি পূজা করবে তারা আমার শত্রু, তুমি তাদের ধ্বংস করবে।

পরদিন মুসা ইহুদিদের সকলকে ডেকে বললেন তোমরা সকলে আগামী দুদিন শুদ্ধ পবিত্রভাবে থাকবে। তৃতীয় দিন দেবদূতের আবির্ভাব হবে। তখন আমরা তাঁকে অনুসরণ করব।

দুদিন কেটে গেল। তৃতীয় দিন ভোর থেকেই ঘন মেঘে আকাশ ছেয়ে গেল। তারই সাথে ঘনঘন বিদ্যুতের চমক, বজ্রের নির্ঘোষ। হঠাৎ ঘন মেঘপুঞ্জের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলো এক তীব্র আলোকচ্ছটা। তার আলোয় সব অন্ধকার কেটে গেল। দেখা গেল একট টুকরো ভাসমান মেঘ আকাশ থেকে নেমে এলো সিনাই পর্বতের মাথায়। এক মেঘ থেকে সাদা ধোঁয়ার কুন্ডলী বের হয়ে পাহাড়ের সমস্ত চূড়াকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। এমন সময় সেই মেঘপুঞ্জ থেকে অলৌকিক কণ্ঠস্বর ভেসে এলো, মুসা, তুমি পাহাড়ের চূড়ায় উঠে এসো।

পাহাড়ের চূড়ায় উঠতেই মুসা শুনতে পেলেন আল্লাহর কণ্ঠস্বর, হে আমার প্রিয় ভক্ত, আমি তোমার মাধ্যমে সমস্ত ইহুদিদের দশটি নিয়ম জানাতে চাই। শুধু আমাকে মানলেই চলবে না। এই দশটি নিয়ম তোমাদের সকলকে মেনে চলতে হবে। আল্লাহ তখন মুসার কানে কানে দশটি নির্দেশ দিলেন। এদের বলে টেন কমান্ডমেন্টস।

মুসাকে আরো কিছু নির্দেশ দিয়ে আল্লাহর অদৃশ্য কণ্ঠস্বর বাতাসে মিলিয়ে গেল। ঝরে গেল সেই আলোকরশ্মি মেঘপুঞ্জ। সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে এলো। নিয়ম দশটি নিচে দেয়া হলো-

১. আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো ঈশ্বর নেই। তোমরা আল্লাহ ছাড়া অপর কোনো দেবতার ইবাদত করবে না।

২. আল্লাহকে শুধু উপাস্য হিসেবে মান্য করলেই হবে না। তাঁর প্রতিটি নির্দেশ আদেশ মেনে চলতে হবে।

৩. সপ্তাহের ছয় দিন কাজ করবে। সপ্তম দিন কোনো কাজ করবে না। এই দিন স্যাবাথ বা পবিত্র বিশ্রামের দিন।

৪. পিতামাতাকে ভক্তি করবে, শ্রদ্ধা করবে, তাঁদের প্রতি পালনীয় কর্তব্য অবশ্যই পালন করবে।

৫. কোনো মানুষকে হত্যা করো না।

৬. কোনো নারী বা পুরুষ কখনোই ব্যভিচার করবে না।

৭. অপরের দ্রব্য অপহরণ করবে না।

৮. মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না।

৯. অন্য জিনিসের প্রতি কোনো লোভ করবে না বা যাতে অন্যের অধিকার আছে তা গ্রহণ করবে না।

১০. উপাসনাস্থলে বেদী নির্মাণ করে পশুবলি দিতে হবে।

পাথর স্থাপন করা হলো পাহাড়ের গায়ে। যাতে ইহুদিদের ভবিষ্যৎ বংশধররা জানতে পারে ঈশ্বরের আদেশের কথা।

এবার মুসা ঈশ্বরের ধ্যান করার জন্য পাহাড়ের চূড়ায় উঠে গেলেন। দীর্ঘ চল্লিশ দিন ধরে গবির সাধনায় মগ্ন হয়ে রইলেন মুসা। এদিকে মুসার অনুপস্থিতিতে সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়ল। সকলে এসে ধরল মুসার ভাই অ্যারনকে। সে ভুলে গেল টেন কম্যান্ডমেন্টসের নির্দেশ। সে একটি সোনার বাছুর তৈরি করে বলল, এই বাছুরটিকেই আল্লাহর প্রতীক বলে পূজা কর। তারপর একে বলি দিয়ে পূজা শেষ করব। সকলে বাছুর পূজার আনন্দে মেতে উঠল। ইহুদিদের এই মূর্তিপূজা দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন আল্লাহ। তিনি মুসাকে বললেন, ওদের এই গর্হিত কাজের জন্য আমি সকলকে ধ্বংস করব। সৃষ্টি করব নতুন এক জাতি। মুসা বুঝতে পারলেন আল্লাহ ইহুদিদের অন্যায় আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন। তিনি নতজানু হয়ে বসে বললেন, হে প্রভু, তুমি তোমার সন্তানদের এই অপরাধ মার্জনা কর।

মুসার কথায় শান্ত হলেন আল্লাহ। তিনি তাঁর উপদেশ-নির্দেশ লেখা আরো দুটি পাথর দিলেন। মুসা সেই পাথর দুটি নিয়ে পাহাড় থেকে নিচে নামতেই দেখতে পেলেন সোনার বাছুর মূর্তিকে ঘিরে ইহুদিরা আনন্দ উৎসবে মেতে উঠেছে। ইহুদিদের এই অসংযমী ধর্মবিরুদ্ধ আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন মুসা।

তাই তিনি ক্রুদ্ধ স্বরে গর্জন করে উঠলেন, তোমরা এই নাচ ও পূজা উৎসব বন্ধ কর। ইহুদিরা কোনো দিন মুসার এই ক্রুদ্ধ মূর্তি দেখেনি। তারা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়ল। মুসা বললেন, তোমরা যারা আল্লাহর নির্দেশ মান্য করে আমার সঙ্গী হতে চাও তারা আমার ডানদিকে এসে দাঁড়াও। যারা আল্লাহর নির্দেশিত পথ অনুসরণ করতে না চাও তারা সকলে বাঁ দিকে যাও। ইহুদিরা সকলেই মুসার ডান দিকে এসে দাঁড়াল। মুসা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, তোমরা যে অন্যায় করেছ তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। মুসা বললেন, প্রত্যেক পরিবারের একজন তরবারি নিয়ে এগিয়ে এসো। সকলে তরবারি নিয়ে আসতেই মুসা বললেন, এই তরবারি দিয়ে তোমাদের যে কোনো একজন ভাই, বন্ধু কিংবা প্রিয়জনকে হত্যা করব। এ আমার নির্দেশ নয়, আল্লাহর আদেশ।

সকলেই নতমস্তকে সেই আদেশ মেনে নিল। মুসা আর ইহুদিদের সাথে একত্রে বাস করতেন না। তিনি আলাদা তাঁবুতে থাকতেন। দিনরাত আল্লাহর ধ্যানেই মগ্ন হয়ে থাকতেন। মাঝে শুধু আল্লাহর নির্দেশগুলো প্রচার করতেন। দশটি অনুশাসন ছাড়াও এগুলো ছিল স্বতন্ত্র নির্দেশ।

১. বিদেশীদের স্বজাতির মানুষদের মতোই ভালোবাসবে।

২. কেনাবেচার সময় ব্যবসায়ীরা যেন ওজনে কারচুপি না করে, সঠিক দাম নেয়।

৩. অন্যের স্ত্রীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক করা চলবে না।

৪. মূর্তিপূজা, জাদুবিদ্যা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ।

আল্লাহর নির্দেশে সকলে প্যালেস্টাইনে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলো। তিন দিন চলার পর তারা এসে পড়ল ক্যানান নগরের প্রান্তে। এখানেই শিবির স্থাপন করা হলো। মুসা ইহুদিদের মধ্যে থেকে বারোজন অভিজ্ঞ মানুষকে পাঠালেন প্যালেস্টাইনে। তারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তর পরিদর্শন করে এসে জানাল প্যালেস্টাইনের দক্ষিণ দিকটাই সবচেয়ে সমৃদ্ধ অঞ্চল।

মুসা বললেন, আমরা প্যালেস্টাইনের দক্ষিণেই বসতি স্থাপন করব, তোমরা সকলে এগিয়ে চল। প্যালেস্টাইনের সীমান্ত প্রদেশে তখন বাস করত আমালেকিত ও কানানিত নামে দুটি উপজাতি। এই দুই উপজাতি বহুদিন ধরেই প্যালেস্টাইনে বাস করছিল। দুই উপজাতির মানুষরা এক সঙ্গে ইহুদিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আচমকা এই আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না ইহুদিরা। তারা আত্মরক্ষার জন্য পালিয়ে গেল হর্মা নামে এক নির্জন প্রান্তরে।

মুসা বুঝতে পারলেন প্যালেস্টাইনে প্রবেশ করতে গেলে অন্য পথ দিয়ে প্রবেশ করতে হবে। তারা এসে পড়লেন ক্যানানিতে রাজ্যের প্রান্তে। অপরিচিত ইহুদিদের দেখেই ক্যানানিতে রাজা তাদের আক্রমণ করলেন। এবার আগে থেকেই প্রস্তুত ছিল ইহুদিরা। মুসার বুদ্ধি-কৌশলে তারা পরাজিত হলো। অবশেষে তারা এসে পড়লেন জর্ডান নদীর তীরে। নদীর ওপারে মোয়াবের রাজ্য। সেই রাজ্য পার হলেই প্যালেস্টাইন। জর্ডানের তীরে এক উঁচু পাহাড়ের ওপর উঠলেই দেখা যায় প্যালেস্টইনের সবুজ প্রান্তর।

এদিকে মুসাও উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিলেন প্যালেস্টাইনের মাটিতে পা দেয়ার জন্য। এমন সময় আল্লাহর দৈববাণী শুনতে পেলেন। হে আমার প্রিয় ভক্ত, তোমার পৃথিবী ছাড়ার সময় হয়েছে, তুমি প্রস্তুত হও। পরদিনই সমস্ত ইহুদিকে ডেকে আল্লাহর আদেশের কথা বলরেন। সকলের সামনে সমস্ত দায়িত্বভার ত্যাগ করে জোশুয়ার ওপর অর্পণ করলেন।

সকলকে উপদেশ দিয়ে তিনি প্রার্থনায় বসলেন। বুঝতে পারলেন তাঁর সময় শেষ হয়েছে। দীর্ঘ ১২০ বছর ধরে পৃথিবীর কত কিছুই তো প্রত্যক্ষ করলেন। গত চল্লিশ বছর মেষপালক যেমন তার মেষের পালকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়, তিনি তেমনি সমগ্র ইহুদি জাতিকে মিসর থেকে নিয়ে এসেছেন প্যালেস্টাইনের প্রান্তরে। জীবনে কোনো দিন সুখভোগ করেননি। বিলাসিতা করেননি। ধর্মের পথে সৎ সরল জীবন-যাপন করেছেন। প্রতিমূহূর্তে নিপীড়িত ইহুদি জাতির প্রতি নিজের অন্তরের অকুণ্ঠ ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন। তাদের নানা বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। এত দিনে তাঁর সব কাজ শেষ হলো।

হযরত ঈসা (আ.)

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ১০০ মনীষীর জীবনী

আনুমানিক ৬-৩০ খ্রিষ্টাব্দ

বিবি মরিয়ম নাছেরা নামক একটি শহরের অধিবাসিনী ছিলেন। নাছেরা শহরটি বাইতুল মুকাদ্দাসের অদূরেই অবস্থিত ছিল। বিবি মরিয়ম পিতা মাতার মানত পূর্ণ করার জন্য বাইতুল মুকাদ্দাসের খেদমতে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বাল্যকাল থেকেই অতিশয় সুশীলা এবং ধর্মানুরাগিণী ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল ইমরান এবং নবী জাকারিয়া (আ.)-এর শ্যালিকা বিবি হান্না তার জননী ছিলেন।

একদিন বিবি মরিয়ম নামাজ পড়ছিলেন, হঠাৎ ফেরেশতা জিব্রাঈল অবতীর্ণ হলেন। তিনি বললেন, তোমার প্রতি সালাম, তুমি আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্তা। আল্লাহ তোমার সাথে রয়েছেন।

বিবি মরিয়ম এই অপ্রত্যাশিতপূর্ব সম্বোধনে ভীতচকিতা হলেন। ভাবতে লাগলেন-কে এলো, কিসের সালাম। হযরত জিব্রাঈল (আ.) বললেন-আমি আল্লাহর ফেরেশতা জিব্রাঈল। তুমি ভীত হইও না; তুমি পবিত্র সন্তান লাভ করবে, এই সুসংবাদ তোমাকে দিতে এসেছি।

বালিকা ভীত হলেন এবং বললেন-তা কেমন করে হবে? আমি যে কুমারী। আমি স্বামীর সঙ্গ লাভ করিনি।

ফেরেশতা বললেন, 'আল্লাহর কুদরতেই হবে এটি। তাঁর কাছে এটি কঠিন কাজ নয়।'

এই বলে ফেরেশতা অন্তর্হিত হলেন। ছয় মাস পূর্বে হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর স্ত্রী গর্ভবতী হয়েছেন-এখন আবার কুমারী মরিয়ম আল্লাহর কুদরতে গর্ভবতী হলেন।

বিবি মরিয়ম যদিও আল্লাহর কুদরতে সন্তানসম্ভবা হলেন, কিন্তু দেশের লোকেরা তা মেনে নেবে কেন? কুমারী নারীর এভাবে গর্ভবতী হওয়ার ফলে সবাই তাকে বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে বের করে দিলেন-এমন কি তাকে স্বগ্রামও ছেড়ে যেতে হলো। সঙ্গী সহায়হীন অবস্থায় গর্ভবতী মরিয়ম একটি নির্জন প্রান্তরে সন্তান প্রসব করলেন।

বিপদাপন্ন মরিয়ম কোনো আশ্রয় খুঁজে না পেয়ে একটি শহরের দ্বারপ্রান্তে আস্তাবলের একটি পতিত প্রাঙ্গণের একটি খেজুর গাছের নিচে আশ্রয় নিলেন। হায়-যিনি পৃথিবীর মহা সমমানিত নবী, তিনি সেই নগণ্য স্থানে ভূমিষ্ঠ হলেন। যে মহানবীর ধর্মানুসরণ আজ পৃথিবীময় বিসতৃত, শক্তি এবং সমমানে যারা পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে রয়েছে; তাদের নবী ভূমিষ্ঠ হলেন একটি আস্তাবলের অব্যবহার্য আঙিনায়। দরিদ্রতম পিতা-মাতার সন্তানও এই সময় একটু শয্যালাভ করে থাকে, একটু শান্তির উপকরণ পায়, কিন্তু মরিয়মের সন্তান শোয়ানোর জন্য আস্তাবলের ঘরটুকু ছাড়া আর কিছুই ভাগ্যে হলো না।

আট দিন বয়সে সন্তানের ত্বক ছেদন করা হলো। তাঁর নামকরণ করা হলো ঈসা। ইনি মছিহ নামে প্রসিদ্ধ হয়েছেন।

হযরত মুসা (আ.)-এর শরিয়ত অনুসারে বাদশাহ কিংবা পয়গম্বর তাঁর পদে বহাল হওয়ার অনুষ্ঠানে, তেল লেপন করার নিয়ম ছিল। এছাড়া তাওরাত কিতাবে হযরত ঈসা (আ.)-এর নাম মছিহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম সন্তান জন্মগ্রহণ করলে একজোড়া ঘুঘু জাতীয় পাখি উৎসর্গ করার নিয়ম হযরত মুসা (আ.)-এর শরিয়তের বিধান ছিল।

মরিয়ম সুচি-স্নাতা হওয়ার পর সন্তান সাথে নিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাসে গেলেন এবং সেখানে গিয়ে পাখির মানত পালন করলেন।

এই সময় একদল অগ্নিপূজক হযরত ঈসা (আ.)-কে খুঁজে ফিরছিল। তারা জ্যোতিষী ছিল। নক্ষত্র দেখে তারা 'হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্ম হয়েছে' এটি জানতে পেরেছিল। হিরুইস বাদশাহ এটি শুনে ভয় পেলেন এবং সেই অনুসন্ধানকারী দলের কাছে গোপনে বললেন যে, তারা যেন সেই বালকের সন্ধান করে কোথায় আছে তা বের করে। অগ্নিপূজকরা খুঁজতে খুঁজতে বিবি মরিয়মের কাছে পৌঁছল ও সেই ক্ষুদ্র শিশুকে সেজদা করল এবং সেখাতে মানত ইত্যাদি সম্পন্ন করল। রাতে তারা স্বপ্নে দেখল, তাদের হিরুইসের কাছে ফিরে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা হিরুইস তার জীবনের শত্রু। মরিয়ম এরূপ স্বপ্ন দেখলেন যে, সম্রাট এই সন্তানের শত্রু, সে তাকে হত্যা করতে চায়। সে যেন শিশুকে নিয়ে মিসরে চলে যায়। জ্যোতিষীরা সম্রাটের কাছে আর ফিরে গেল না। এতে বাদশাহ ভয়ানক রাগ হলো। সে হুকুম করল যে, বাইতুল্লাহর এবং এর আশপাশের সকল বস্তির সন্তানদের যেন হত্যা করে ফেলা হয়।

ইতিপূর্বে মরিয়ম তাঁর সন্তান নিয়ে মিসরে রওনা হয়ে গিয়েছিলেন। হিরুইস যত দিন জীবিত ছিল, তত দিন সন্তান নিয়ে তিনি মিসরেই অবস্থান করলেন। হিরুইসের মৃত্যুর সংবাদ শোনার পর তিনি নিজ দেশ নাছেরায় চলে এলেন।

সন্তান দিন দিন বাড়তে লাগল। বয়স বাড়ার সাথে সাথে ঈসার মধ্যে প্রখর জ্ঞান এবং তীক্ষ্ণ মেধাশক্তির পরিচয় ফুটে উঠল। আল্লাহর বিশেষ একটি অনুগ্রহ যে তাঁর ওপর রয়েছে, দিন দিন তা প্রকাশ পেতে শুরু করল। ঈসার মাতা ঈসা (আ.)-সহ প্রতি বছর ঈদের উৎসব ইরুসালেমে যোগদান করতেন। ঈসার ১২ বছর বয়সে ইরুসালেমে বড় বড় জ্ঞানী এবং পণ্ডিতবর্গের সাথে ধর্ম বিষয়ে আলোচনা করতেন। তাঁর বাকপটুতা এবং তত্ত্বজ্ঞান শুনে পণ্ডিতরা অবাক হয়ে যেতেন। ক্রমান্বয়ে হযরত ঈসা আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পূর্ণতা লাভ করতে লাগলেন। ত্রিশ বছর বয়সে তিনি আল্লাহর কাছ থেকে 'ওহি' লাভ করেন এবং নবীরূপে ধর্মপ্রচার করতে শুরু করলেন।

হযরত ইয়াহহিয়া বিবি মরিয়মের খালাতো ভাই হতেন। তিনি ইয়ারদন নদীর তীরে লোকদের ধর্মোপদেশ দান করতেন। হযরত ঈসা (আ.) সেখানে গিয়ে ওয়াজ করতে শুরু করেন।-ওহি আসা শুরু করার পর থেকে ইনজিল কিতাব অবতীর্ণ হতে থাকে। তিনি

তাঁর নবুয়তের প্রমাণস্বরূপ বহু অলৌকিক কার্যাবলি দেখাতে শুরু করেন। মাটি দিয়ে পাখি তৈরি করে উড়িয়ে দেয়া, অন্ধকে দৃষ্টিদান, বোবাকে বাকশক্তি দান, কুষ্ঠকে আরোগ্য করা, পানির উপরে হাঁটা ইত্যাদি তার মোজেজা ছিল।

তাঁর আধ্যাত্মিক শক্তির বলে বহু রোগী আরোগ্য লাভ করে। বহু লোক ধর্মজ্ঞান লাভ করে। সর্বপ্রথমে যারা হযরত ঈসা (আ.)-এর ওপর ঈমান এনেছিলেন, সাথে থেকে সাহায্য করেছিলেন তাদের 'হাওয়ারি' বলা হতো। তাঁরা সর্বদা হযরত ঈসা (আ.)-এর সাথে থাকতেন। হযরত ঈসা (আ.) যখন নবী হন, সেকালে ইয়াহুদি ধর্মগুরুরা অতিশয় শিথিল হয়ে পড়েছিলেন। তাদের মধ্যে প্রকৃত ধর্মানুভূতির পরিবর্তে ভণ্ডামি প্রবেশ করেছিল। তাদের মধ্যে কেবল ধর্মের বাহ্যিক আবরণ ছিল। হযরত ঈসা (আ.) এর ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি তাঁর ওয়াজ বক্তৃতায় ইয়াহুদি ধর্মগুরুদের কঠোর সমালোচনা করতেন। এতে সেই সকল বাহ্যাবরণ বিশিষ্ট ইয়াহুদি ধর্মপ্রচারকরা হযরত ঈসা (আএর বাণী ছিল আল্লাহর বাণী। তা -(.আ) এর ঘোর শত্রুতে পরিণত হন। কিন্তু হযরত ঈসা-(. যে শুনত তার হৃদয়ই তাতে আ ,এমনই হৃদয়গ্রাহী হতো যেকৃষ্ট হতো। বিদ্বেষপরায়ণ ইয়াহুদি পুরোহিতরা কোনো কথায়ই হযরত ঈসা (আ.) কে ধরতে পারতেন না। তারা হযরত ঈসা (আ.)-কে নানা ছুতানাতায় দোষী সাব্যস্ত করার চেষ্টায় লিপ্ত হলেন।

হযরত ঈসা (আ.) আল্লাহর অত্যধিক প্রেমে অভিভূত হয়ে আল্লাহকে পিতা বলেছিলেন। এরূপ আরো দুই-একটি দৃষ্টান্তমূলক বাক্য নিয়ে হিংসাপরায়ণ ইয়াহুদি আলেমগণ নানা কথা সৃষ্টি করলেন। এভাবে তারা হযরত ঈসা (আ.) কে ধর্মদ্রোহী কাফের বলে ফতোয়া দিলেন। তাদের শরিয়তে মৃত্যুই সেই সকল অপরাধের একমাত্র সাজা। দেশে তখন রুমীয়দের রাজত্ব ছিল। তখনকার দিনে রাজা ছাড়া আর কারো মৃত্যুদণ্ড দেয়ার অধিকার ছিল না। সুতরাং তারা সম্রাটের কানে হযরত ঈসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করতে শুরু করল।

হযরত ঈসা (আ.) তার বক্তৃতার অধিকাংশ সময় আসমানি বাদশাহের কথা উল্লেখ করতেন। এতে শত্রুদের একটি সুযোগ জুটে গেল। তারা আসমানি বাদশাহীর ব্যাখ্যা একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে হযরত ঈসা (আ.)-এর প্রতি রাজদ্রোহীর অভিযোগ সৃষ্টি করল। গোপনভাবে তাকে ধরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতে লাগল।

অদৃষ্টের এমনি বিড়ম্বনা, যে হাওয়ারি দল ঈসা (আ.)-এর সঙ্গী এবং বিশ্বস্ত বন্ধুরূপে বিরাজ করতেন, তারাই এখন গুপ্তচর হলেন। সেই হাওয়ারিদের মধ্যে একজনের নাম ছিল ইয়াহুদ। শত্রুদের কাছ থেকে তিনি টাকার ঘুষ গ্রহণ করে হযরত ঈসা (আ.)- কে রুমীয় সৈন্যদের হাতে ধরিয়ে দিলেন।

হাওয়ারিদের মধ্যে পিতর ছিল একজন ঘনিষ্ঠ এবং প্রধান সঙ্গী, রাজদ্রোহের অপরাধ থেকে বাঁচার জন্য তিনিও সম্রাটের দরবারে নিজ পরিচয় গোপন এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বলে প্রকাশ করলেন। হযরত ঈসা (আ.) ধৃত হলেন এবং রাজবিচারে তিনি মৃত্যুদণ্ড লাভ করলেন। সে সময়ের মৃত্যুদণ্ডে এখনকার মতো গলায় ফাঁসি দেয়ার ব্যবস্থা ছিল না। ছলিবের সাহায্যে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হতো।

ছলিবের আকৃতি হলো এই-একটি লম্বা কাঠের উপরের অংশে আর একখানি কাঠ আড়াআড়িভাবে জুড়ে দেয়া হতো। তাতে অপরাধীকে এমনিভাবে ঝুলিয়ে দেয়া হতো যে অপরাধীর পৃষ্ঠদেশ কাষ্ঠদ্বয়ের সংযুক্তি স্থলের ওপর রক্ষিত হতো। আড়া কাঠের উভয় দিকে দুই হাত বিস্তারিত করে দিয়ে তাতে পেরেক মেরে দেয়া হতো। কারো হাঁটুতেও পেরেক ফুঁড়ে কাঠসংলগ্ন করে দেয়া হতো। এই অবস্থায় ঝুলে থেকে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও যন্ত্রণায় ছটফট করে মরে যেত। হযরত ঈসা (আ.) কে ছলিবে বিদ্ধ করে রাখা হলো। পরদিন ইয়াহুদিদের উৎসবের দিনে কোনো অপরাধীর ছলিবে ঝুলন্ত থাকা তাদের ধর্মমতে বিধেয় ছিল না। হযরত ঈসা (আ.) কে দুপুরের দিকে ক্রুশে বিদ্ধ করা হয়েছিল। পায়ে কাঁটা বিদ্ধ করা হচ্ছিল না। তবুও তিনি সেই যাতনায়ই মুষড়িয়ে পড়লেন এবং

চেতনা হারালেন; তিনি শরীরের দিক দিয়েও কৃশকায় ছিলেন। ঈদের দিনের কারণে যখন সন্ধ্যার দিকে তাকে ক্রুশ থেকে খসান হলো তখন তাকে মৃত বলেই ধারণা করা হলো। তাকে গোরস্থানে পাঠিয়ে দেয়া হলো এবং দাফন করা হলো। কোনো সহৃদয় ব্যক্তি তাকে কবর থেকে উঠিয়ে এনেছিলেন। পরে তিনি চেতনা লাভ করলেন। অতঃপর তিনি নিরুদ্দেশ হন। তিনি কোথায় কীভাবে আত্মগোপন করেন তার সঠিক তত্ত্ব জানা যায়নি। কোরআন শরিফে তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে যে, তাঁকে হত্যা করা হয়নি। তিনি ক্রুশে প্রাণ দান করেননি। বরং মৃত্যুর মতোই ধারণা করা হয়েছিল, পরে আল্লাহ তাকে পৃথিবী থেকে তুলে নিলেন। এর ৫০০ বছর পরে হযরত মোহামমদ মোস্তফা এই পৃথিবীতে সংবাদ দিয়েছেন। (.সা)

উইলিয়াম শেক্সপিয়র (আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ১৫৬৪-১৬১৬)

বিশ্বের ইতিহাসে উইলিয়াম শেক্সপিয়র এক বিস্ময়। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার-যার সৃষ্টি সম্বন্ধে এত বেশি আলোচনা হয়েছে, তার অর্ধেকও অন্যদের নিয়ে হয়েছে কি না সন্দেহ। অথচ তার জীবনকাহিনী সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা যায় না বললেই চলে।

ইংল্যান্ডের ইয়র্কশায়ারের অন্তর্গত এভন নদীর তীরে স্ট্রাটফোর্ড শহরে এক দরিদ্র পরিবারে শেক্সপিয়র জন্মগ্রহণ করেন। স্থানীয় চার্চের তথ্য থেকে যা জানা যায় তাতে অনুমান তিনি সম্ভবত ১৫৬৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ এপ্রিল জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা জন শেক্সপিয়রের মা ছিলেন আর্ডেন পরিবারের সন্তান। শেক্সপিয়র তার As you like it নাটকে মায়ের নামকে অমর করে রেখেছেন। আঠার বছর বয়সে শেক্সপিয়র বিবাহ করলেন তার চেয়ে ৮ বছরের বড় অ্যানি হাতওয়েকে। বিবাহের কয়েক মাসের মধ্যে অ্যানি এক কন্যাসন্তানের জন্ম দেয়। তার নাম রাখা হয় সুসানা। এর দুই বছর পর দুটি যমজ সন্তানের জন্ম হয়। ছেলে হ্যামলেট মাত্র ১ বছর বেঁচে ছিল।

শোনা যায় সংসার নির্বাহের জন্য তাকে নানা কাজকর্ম করতে হতো। একবার ক্ষুধার জ্বালায় স্যার টমাসের একটি হরিণকে হত্যা করেন। গ্রেফতারি পরোয়ানা এড়াতে তিনি পালিয়ে আসেন লন্ডনে। কিন্তু এই কাহিনী কতদূর সত্য সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়ে যায়। তবে যে কারণেই হোক তিনি স্ট্রাটফোর্ড ত্যাগ করে লন্ডন শহরে আসেন।

সম্পূর্ণ অপরিচিত শহরে কাজের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে পেশাদারি রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন।

নাট্যজগতের সাথে এই প্রত্যক্ষ পরিচয়ই তার অন্তরের সুপ্ত প্রতিভার বীজকে ধীরে ধীরে অঙ্কুরিত করে তোলে।

নাট্য সম্পাদনা কাজ করতে করতেই শেক্সপিয়র অনুভব করলেন দর্শকের মনোরঞ্জনের উপযোগী ভালো নাটকের একান্তই অভাব। সম্ভবত মঞ্চের প্রয়োজনেই শেক্সপিয়রের নাটক লেখার সূত্রপাত। ঠিক কখন তা অনুমান করা কঠিন। তবে সুদীর্ঘ গবেষণার পর প্রাথমিকভাবে একটি তালিকা প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে তা থেকে অনুমান করা হয় যে তার নাটক রচনার সূত্রপাত ১৫৯১ সাল। এই

সময় তিনি রচনা করেন তার ঐতিহাসিক নাটক হেনরি ঠও-এর তিন খণ্ড। নাটক রচনার ক্ষেত্রে এগুলো যে তার হাতেখড়ি তা সহজেই অনুমান করা যায়। কারণ এতে শেক্সপিয়রের প্রতিভার সামান্যতম পরিচয় নেই। এর পরের বছর লেখা নাটক রিচার্ড থ্রি (Richard III) অনেকাংশে উন্নত।

১৫৯২ সালে ইংল্যান্ডে ভয়াবহ প্লেগ রোগ দেখা গিয়েছিল। তখন প্লেগের অর্থ নিশ্চিত মৃত্যু। দলে দলে মানুষ শহর ছেড়ে পালাতে আরম্ভ করল। অনিবার্যভাবে রঙ্গশালাও বন্ধ হয়ে গেল। নাটক লেখার তাগিদ নেই, শেক্সপিয়র রচনা করলেন তার দুটি কাব্য, ভেনাস ও অ্যাডোনিস এবং দি রেপ অব লুক্রি। এই দুটি দীর্ঘ কবিতাই তিনি সাদমটনের আর্লকে উৎসর্গ করেন।

কবি-নাট্যকার হিসেবে শেক্সপিয়রের খ্যাতি ক্রমশই চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছিল। বিভিন্ন নাট্যগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে তাদের দলভুক্ত হওয়ার জন্য তার কাছে আমন্ত্রণ আসছিল। তিনি লর্ড চেম্বারলিনের নাট্যগোষ্ঠীতে যোগ দিলেন (১৫৯৪)। এই সময় থেকে শেক্সপিয়রের হাত থেকে বের হতে থাকে এক একটি অবিস্মরণীয় নাটক-টেমিং অব দি শ্রু ,মার্চেন্ট অব ভেনিস ,রোমিও জুলিয়েট , সালে হেনরি এইট ১৬১৩ হ্যামলেট। তার শেষ নাটক রচনা করেন ,ওথেলো ,জুলিয়াস সিজার ,হেনরি ফোর।

একদিন যিনি তস্করের মতো স্ট্রাটফোর্ড ছেড়ে পালিয়ে এসেছিলেন সেখানেই বিরাট এক সম্পত্তি কিনলেন। ইতিপূর্বে লন্ডন শহরেও একটি বাড়ি কিনেছিলেন। সম্ভবত ১৬১০ সাল পর্যন্ত এই বাড়িতেই বাস করেছিলেন শেক্সপিয়র। এরপর তিনি অবসর জীবন যাপন করার জন্য চিরদিনের জন্য লন্ডন শহরের কলকোলাহল, প্রিয় রঙ্গমঞ্চ ত্যাগ করে চলে যান স্ট্রাটফোর্ড। একটি মাত্র নাটক ছাড়া এই পর্বে আর কিছুই লেখেননি। ছয় বছর পর ১৬১৬ সালের ২৩ এপ্রিল (দিনটি ছিল তার বাহান্নতম জন্মদিন) তার মৃত্যু হলো। আগের দিন একটি নিমন্ত্রিত বাড়িতে গিয়ে প্রচুর পরিমাণে মদ্য পান করেন। শীতের রাতে পথেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। আর সুস্থ হয়ে ওঠেনি শেক্সপিয়র। জন্মদিনেই পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিলেন।

অথচ সবচেয়ে বিস্ময়ের, শেক্সপিয়র তার নাটকের প্রায় প্রতিটি কাহিনী দাঁড় করিয়েছেন, উত্তরণ ঘটিয়েছেন এক অসাধারণত্বে। ক্ষুদ্র দীঘির মধ্যে এনেছেন সমুদ্রের বিশালতা।

শুধু নাটক নয়, কবি হিসেবেও তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিদের অন্যতম। তার প্রতিটি কবিতাই এক অপূর্ব কাব্যদ্যুতিতে উজ্জ্বল। দুটি কাব্য এবং ১৫৪টি সনেট তিনি রচনা করেছেন। শেক্সপিয়রের প্রথম কাব্য ভেনাস এবং অ্যাডোনিস। মানুষের অন্তরে দেহগত যে কামনার জন্ম সাহিত্যে তার প্রকাশ ঘটেছে রেনেসাঁ-উত্তর পর্বে। একদিকে দেহগত কামনা অন্যদিকে সৌন্দর্যের প্রতি আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়ে উঠেছে ভেনাস এবং অ্যাডোনিসে। কিশোর অ্যাডোনিসের সৌন্দর্যে মুগ্ধ ভেনাস। তার যৌবনে রক্তের স্পন্দন। সে সমস্ত মন প্রাণ সত্তা দিয়ে পেতে চায় অ্যাডোনিসকে। পূর্ণ করতে চায় তার দেহমনের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু পুরুষ কি শুধুই নারীর দেহের মধ্যে পরিপূর্ণ তৃপ্তি পেতে পারে? সে যেতে চায় বন্য বরাহ শিকার করতে। চমকে ওঠে ভেনাস। মনের মধ্যে জেগে ওঠে শঙ্কা যদি কোনো বিপদ হয় তার প্রিয়তমের, বলে ওঠে-

বরাহ... যে যখন ক্রুদ্ধ হয়
তার দুই চোখ জ্বলে ওঠে জোনাকির মতো
যেখানেই সে যাক তার দীর্ঘ নাসিকায়
সৃষ্টি করে কবর।...
যদি সে তোমাকে কাছে পায়...

উৎপাটিত তৃণের মতোই

উপড়ে আনবে তোমার সৌন্দর্য।

তবুও শিকারে যায় অ্যাডোনিস। দুর্ভাগ্য তার, বন্য বরাহের হিংস্র আক্রমণে ছিন্ন হয় তার দেহ। হাহাকার করে ওঠে ভেনাস। প্রিয়তমের মৃত্যুর বেদনায় সমস্ত অন্তর রক্তাক্ত হয়ে ওঠে।

রচনার কাল অনুসারে শেক্সপিয়রের নাটকগুলোকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগের বিস্তার ১৫৮৮ থেকে ১৫৯৫ সাল পর্যন্ত। এই পর্বের উল্লেখযোগ্য নাটক রিচার্ড থ্রি, কমেডি অব এররস, টেমিং অব দি শ্রু, রোমিও জুলিয়েট।

১৫৯৬ থেকে ১৬০৮। এই সময়ে রচিত হয়েছে তার শ্রেষ্ঠ চারটি ট্র্যাজেডি-হ্যামলেটম্যাকবেথ। ,কিং লিয়ার ,ওথেলো ,

তিনটি সমাপ্ত। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দি টেম্পেস্ট। ,টি নাটক রচনা করেন তার মধ্যে দুটি অসমাপ্ত৫ শেষ পর্বে যে

ঐতিহাসি ,শেক্সপিয়রের এই নাটকগুলোর মধ্যে রয়েছে কমেডিক নাটক, ট্র্যাজেডি, রোমাঞ্চ।

কমেডি-শেক্সপিয়রের উল্লেখযোগ্য কমেডি হলো লাভস লেবারস লস্ট, দি টু জেন্টলম্যান অব ভেরোনা, দি টেমিং অব দি শ্রু. কমেডি অব এররস, এ মিড সামার নাইটস ড্রিম, মার্চেন্ট অব ভেনিস, ম্যাচ অ্যাডো অ্যাবাহুট নাথিংস, টুয়েলফথ নাইট, অ্যাজ ইউ লাইক ইট।

এর মধ্যে মাত্র কয়েকটিকে বাদ দিলে সমস্ত নাটক এক অসাধারণ সৌন্দর্যে উজ্জ্বল। প্রতিটি চরিত্রই জীবন্ত প্রাণবন্ত সজীবতায় ভরপুর।

শেক্সপিয়রের বিখ্যাত কমেডিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি কমেডি হলো দি মার্চেন্ট অব ভেনিস।

শেক্সপিয়রের শ্রেষ্ঠ ৩টি কমেডি হলো অ্যাজ ইউ লাইক ইট, টুয়েলফথ নাইট, ম্যাচ অ্যাডো অ্যাবাউট নাথিং। এই কমেডিগুলোর মধ্যে মানব জীবন এক অসামান্য সৌন্দর্যে প্রস্ফুটিত হয়ে আছে। হাসি কান্না আনন্দ সুখ দুঃখ মজার এক আশ্চর্য সংমিশ্রণ ঘটেছে এই নাটকগুলোর মধ্যে। নাটকের সেই সমস্ত পাত্র-পাত্রী যারা সকল অবস্থার সাথে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছে, অন্যকে ভালোবেসেছে, তারাই একমাত্র জীবনে সুখী হতে পেরেছে। এই কমেডির নায়িকারা সকলেই আদর্শ চরিত্রের। অন্যের প্রতি তারা সহৃদয়। পরের জন্য তারা দ্বিধাহীন চিত্তে নিজেদের স্বার্থ বিসর্জন দেয়। একদিকে তারা করুণাময়ী অন্যদিকে তারা বুদ্ধিমতী। শেক্সপিয়রের কমেডিতে নারী চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্বের কাছে পুরুষেরা ম্লান হয়ে যায়।

ঐতিহাসিক নাটক-ইতিহাসের প্রতি শেক্সপিয়রের ছিল গভীর আগ্রহ। একদিকে ইংল্যান্ডের ইতিহাস অন্যদিকে গ্রিক ও রোমান ইতিহাসের ঘটনা থেকেই তিনি তার ঐতিহাসিক নাটকগুলোকে অসাধারণ পর্যায়ে উন্নীত করেছেন। ঐতিহাসিক নাটকগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য রিচার্ড থ্রি, হেনরি ফোর, জুলিয়াস সিজার, অ্যান্টোনি ও ক্লিওপেট্রা। হেনরি ফোর নাটকের এক আশ্চর্য চরিত্র ফলস্টাফ, রাজবিদুষক সে অফুরন্ত প্রাণরসের উৎস। তার চরিত্রের নানা দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও আমাদের মনকে কেড়ে নেয়। এমন আশ্চর্য চরিত্র বিশ্বসাহিত্যে বিরল।

জুলিয়াস সিজার শেক্সপিয়রের আরেকটি বিখ্যাত নাটক। এই নাটকের মুখ্য চরিত্র সিজারস, ব্রুটাস এবং অ্যান্টোনি। রোমের নেতা জুলিয়াস সিজার যুদ্ধ জয় করে দেশে ফিরেছেন। চারদিকে উৎসব। সিজারও উৎসবে যোগ দিতে চলেছেন। সাথে বন্ধু অ্যান্টোনি। হঠাৎ পথের মাঝে এক দৈবজ্ঞ এগিয়ে এসে সিজারকে বলে আগামী ১৫ মার্চ আপনার সতর্ক থাকার দিন।

সিজার দৈবজ্ঞের কথার গুরুত্ব দেন না। কিন্তু দেশের একদল অভিজাত মানুষ তার এই খ্যাতি ও গৌরবে ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠে। তারা সিজারের প্রিয় বন্ধু ব্রুটাসকে উত্তেজিত করতে থাকে। সিজারের এই অপ্রতিহত ক্ষমতা যেমন করেই হোক খর্ব করতেই হবে। না

হলে একদিন সিজার সকলকে ক্রীতদাসে পরিণত করবে।

কিন্তু ব্রুটাস কোনো ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে চাইছিলেন না। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীর দল নানাভাবে ব্রুটাসকে প্ররোচিত করতে থাকে। মানসিক দিক থেকে দুর্বল ব্রুটাস শেষ পর্যন্ত অসহায়ের মতো ষড়যন্ত্রকারীদের ইচ্ছার কাছেই আত্মসমর্পণ করেন।

১৫ মার্চ সিনেটের অধিবেশনের দিন। সকল সদস্য সেই দিন সিনেটে উপস্থিত থাকবে। কিন্তু আগের রাতে বারবার দুঃস্বপ্ন দেখতে থাকেন সিজারের স্ত্রী ক্যালপুনিয়া। তার নিষেধ সত্ত্বেও বীর সিজার সিনেটে গেলে সুযোগ বুঝে বিদ্রোহীর দল একের পর এক ছোরা সিজারের দেহে বিদ্ধ করে। শেষ আঘাত করে ব্রুটাস। প্রিয়তম বন্ধুকে বিশ্বাসঘাতকতা করতে দেখে আর্তনাদ করে ওঠে সিজার, ব্রুটাস তুমিও!

সিজারের মৃত্যুতে উল্লাসে ফেটে পড়ে ষড়যন্ত্রকারীর দল। শুধু একজন প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলতে থাকে, সে অ্যান্টোনি। প্রকাশ্য রাজপথে দাঁড়িয়ে জনসাধারণের কাছে সিজারকে হত্যার কারণ বিশ্লেষণ করে ব্রুটাস। তার বক্তৃতায় মোহগ্রস্ত হয়ে পড়ে জনগণ। তারা ব্রুটাসের জয়ধ্বনি করে ভুলে যায় সিজারের কথা। ব্রুটাস চলে যেতেই বক্তৃতা শুরু করে অ্যান্টোনি। সে সুকৌশলে সিজারের প্রতি জনগণের ভালোবাসা জাগিয়ে তোলে। তাদের কাছে প্রমাণ করে সিজার একজন মহান মানুষ, তাকে অন্যায়ভাবে ব্রুটাস ও অন্যরা হত্যা করেছে।

সমস্ত মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। ষড়যন্ত্রকারীর দল প্রাণভয়ে দেশত্যাগ করে। কিন্তু যুদ্ধে সকলে নিহত হয়। জুলিয়াস সিজার নাটকে ব্রুটাস হত্যাকারী বিশ্বাসঘাতক হলেও তার অন্তর্দ্বন্দ্ব, মানসিক দুর্বলতা, অন্তিম পরিণতি আমাদের মনকে বিষণ্ন করে তোলে।

আর একটি বিখ্যাত ঐতিহাসিক নাটক অ্যান্টোনি ও ক্লিওপেট্রা। এই নাটকের বিষয়বস্তু প্রেম। সুন্দরীশ্রেষ্ঠ ক্লিওপেট্রার সাথে অ্যান্টোনির প্রেম। নাটকের প্রথমে ক্লিওপেট্রাকে এক সাধারণ প্রেমিকা বলে মনে হলেও শেষে তার আত্মত্যাগ তাকে মহীয়সী করে তুলেছে।

ট্র্যাজেডি-শেক্সপিয়রের প্রথম ট্র্যাজেডি রোমিও জুলিয়েট। এতে মানব জীবনের কোনো দ্বন্দ্ব নেই, নেই পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রামের ব্যর্থতার যন্ত্রণা। রোমিও জুলিয়েটের জীবনে যে করুণ পরিণতি ঘটেছে তার জন্যে তাদের পারিবারিক বিবাদই দায়ী। দুটি পরিবার মনটেগু ও ক্যাপিউলেট। প্রভাব প্রতিপত্তিতে কেউ কম যায় না। কিন্তু দুই পরিবারের মধ্যেই তীব্র বিবাদ। সারাটা বছরই ঝগড়া মারামারি লেগেই আছে। ক্যাপিউলেট পরিবারের কন্যা জুলিয়েট। রূপের কোনো তুলনা নেই। শান্ত স্বভাবের মেয়ে। অপরদিকে মন্টেগু পরিবারের সন্তান রোমিও পরিবারের সকলের চেয়ে আলাদা। একদিন দুজনের দেখা হয়। রূপে মুগ্ধ দুই তরুণী-তরুণী প্রেমের বাঁধনে বাঁধা পড়ে যায়। কিন্তু এই প্রেম তো দুই পরিবারের কেউ স্বীকার করবে না। তাই চলে গোপন অভিসার। কিন্তু মিলনের পথে বাধা এসে দাঁড়ায়। জুলিয়েটের বিবাহ স্থির হয় অন্য জায়গায়। অসহায় জুলিয়েট তার গুরু সন্ন্যাসী লরেন্সের কাছে সাহায্য চায় যেমন করেই হোক এই বিয়ে বন্ধ করতেই হবে।

লরেন্স তাকে এক শিশি ওষুধ দেয়। সেই ওষুধের প্রভাবে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়বে জুলিয়েট। মনে হবে মারা গেছে। সেভাবে থাকবে বিয়াল্লিশ ঘণ্টা। তাকে সমাধি দেয়া হবে। এই ঘটনা জানবে শুধু রোমিও। যখন জুলিয়েটের ঘুম ভাঙবে দুজনে পালিয়ে যাবে মান্তুয়ায়।

বিয়ের রাতেই জুলিয়েট সেই ওষুধ খায়, মৃত মনে করে সমস্ত প্রাসাদে কান্নার রোল ওঠে। বিয়ের সাজেই তাকে সমাধিস্থ করা হয়।

দুর্ভাগ্যবশত লরেন্সের পাঠানো সংবাদ ঠিক সময়ে এসে পৌঁছায় না রোমিওর কাছে। জুলিয়েটের মৃত্যুসংবাদ শুনে শোকে দুঃখে সকলের অগোচরে সমাধিক্ষেত্রে গিয়ে তীব্র বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করে। এদিকে জুলিয়েটের জ্ঞান ফিরে আসে। প্রিয়তমের মৃত্যু দৃশ্যে নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না। রোমিওর ছোরা তুলে নিয়ে নিজের বুকে বিঁধিয়ে দেয়। তার মৃতদেহ লুটিয়ে পড়ে রোমিওর ওপর। দুই পরিবারের লোকজনই সবকিছু জানতে পেরে ছুটে আসে। দুটি তরুণ প্রাণের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শেষ হয় পারিবারিক বিবাদ। রোমিও জুলিয়েট নাটকে প্রেমের দৃশ্যগুলো শেক্সপিয়রের কবিত্বগুণে মনোহারি হয়ে উঠেছে। ভাষার লাবণ্য আর মাধুর্য নাটকীয়তার অসাধারণত্বের জন্য রোমিও জুলিয়েট যুগ যুগ ধরে মানুষের মন কেড়ে নিয়েছে।

মানুষের মানসিক দুর্বলতা থেকে কীভাবে ট্র্যাজেডি রচিত হয় তারই প্রকাশ ঘটেছে শেক্সপিয়রের বিখ্যাত ট্র্যাজেডি ওথেলোতে। ভেনিসের বীর সেনাপতি ওথেলো। কৃষ্ণকায়মূর। সাহসী দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। তার বীরত্বের কাহিনী শুনতে শুনতে তাকে ভালোবেসে ফেলেছিল সিনেটার ব্রাবানশিওর সুন্দরী কন্যা ডেসডিমোনা। ওথেলোর সঙ্গে ঘর ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। ব্রাবানশিও অভিযোগ জানাল ডিউকের কাছে। ডিউকের আদেশে সকলের সামনে এসে ডেসডিমোনা জানাল সে ওথেলোকে ভালোবেসে স্বেচ্ছায় ঘর ছেড়ে বের হয়েছে।

অন্যদিকে ব্রাবানশিওর এক আত্মীয় রোডারিগো চেয়েছিল ডেসডিমোনাকে বিয়ে করতে। তার এই ইচ্ছার কথা জানত ওথেলোর এক কর্মচারী ইয়াগো। তার ইচ্ছা ছিল সেনাপতি ওথেলোর সহকারী হওয়ার। কিন্তু ওথেলো সহকারী হিসেবে নির্বাচিত করেছিল বেসিওকে। বেসিওকে তাড়িয়ে দিয়ে সে হবে ওথেলোর সহকারী।

এমন সময় তুর্কিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য ওথেলোকে পাঠানো হলো সাইপ্রাসে। তার অনুগামী হলো ডেসডিমোনা, বেসিও, ইয়াগো ও তার বউ এমিলিয়া।

যুদ্ধে জয়ী হয় ওথেলো। তার সম্মানে আনন্দ উৎসব হয়। রাত গভীর হতেই নগর রক্ষার ভার বেসিওর ওপর দিয়ে ডেসডিমোনার শয়নকক্ষে যায় ওথেলো। ইয়াগো এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। বেসিওকে মদ খাইয়ে মিথ্যা গন্ডগোল সৃষ্টি করে। তারই জন্য তাকে কর্মচ্যুত করে ওথেলো। দুঃখে অনুশোচনায় ভেঙে পড়ে বেসিও। ইয়াগো তাকে বলে ডেসডিমোনার কাছে গিয়ে অনুরোধ করতে। স্ত্রীর কথা ওথেলো কখনোই ফেলতে পারবে না।

বেসিও যায় ডেসডিমোনার কাছে। গোপনে ওথেলো ইয়াগোকে ডেকে বলে দুজনের মধ্যে গোপন প্রণয় আছে। ওথেলোর মনের মধ্যে সন্দেহের বীজ জেগে ওঠে। ওথেলো ডেসডিমোনাকে একটি মন্ত্রপূত রুমাল দিয়েছিল। ডেসডিমোনা কখনো সেই রুমালটি নিজের হাতছাড়া করত না। একদিন ডেসডিমোনার কাছ থেকে রুমালটি হারিয়ে গিয়েছিল। তা কুড়িয়ে নিয়ে এমিলিয়াকে দিল। ইয়াগো দিল বেসিওকে। ডেসডিমোনার কাছে রুমাল না দেখে ওথেলোর সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়। তারই সাথে ওথেলোর মনকে আরও বিষাক্ত করে তোলে ইয়াগো। ক্রোধে আত্মহারা হয়ে ওথেলো ঘুমন্ত ডেসডিমোনাকে গলা টিপে হত্যা করে। তারপরই আসল সত্য প্রকাশ পায়। ইয়াগোকে বন্দি করা হয় আর ওথেলো নিজের বুকে ছুরিবিদ্ধ করে আত্মহত্যা করে। বীর ওথেলোর এই মৃত্যু আমাদের সমস্ত অন্তরকে ব্যথিত করে তোলে।

শেক্সপিয়রের আর একখানি বিখ্যাত নাটক ম্যাকবেথ। শেক্সপিয়রের ট্র্যাজেডির সব নায়িকার মধ্যেই যে মহীয়সী রূপের প্রকাশ দেখতে পাই, লেডি ম্যাকবেথের মধ্যে তা পাই না। ম্যাকবেথ সাহসী বীর কিন্তু মানসিক দিক থেকে কিছুটা দুর্বল, তাই স্ত্রীর কথায় সে চালিত হয়। লেডি ম্যাকবেথের প্ররোচনায় সে খুন করে তার রাজাকে। তারপর সিংহাসন অধিকার করে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত

তাদের মৃত্যুবরণ করতে হয়। লেডি ম্যাকবেথের চরিত্রের মধ্যে পাপের পূর্ণ প্রকাশ ঘটলেও তার চরিত্রে অসাধারণ দৃঢ়তা, অদম্য তেজ, দৃপ্ত ভঙ্গি, মনোবল আমাদের মুগ্ধ করে। তার প্রতিটি কাজের পেছনে ছিল এক উচ্চাশা। কোনো নীচুতার স্পর্শ নেই সেখানে। শেক্সপিয়রের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছে তার হ্যামলেট নাটকে। এক আশ্চর্য চরিত্র এই হ্যামলেট। সে মানুষের চির রহস্যের, কখনো তার উন্মাদের ভাব, কখনো উচ্ছ্বাস, কখনো আবেগ, এরই সাথে ঘৃণা, বিদ্বেষ, ক্রোধ, প্রতিহিংসা। তার চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব যুগ যুগ ধরে পাঠককে বিভ্রান্ত করে তোলে। তাই বোধহয় নাট্যকার বার্নার্ড শ কৌতুক করে বলেছিলেন ডেনমার্কের ওই পাগল ছেলেটা কী করে তার ভোঁতা তলোয়ার দিয়ে পৃথিবীটাকে জয় করে ফেলল, ভাবতে ভাবতে আমার দাড়ি পেকে গেল।

ডেনমার্কের যুবরাজ হ্যামলেট। সবেমাত্র পিতার মৃত্যু হয়েছে। মা তারই কাকাকে বিবাহ করেছে। পিতার মৃত্যুতে শোকাহত হ্যামলেট একদিন রাতে তার কয়েকজন অনুচরসহ পাহারা দিতে দিতে দেখতে পায় হ্যামলেটের পিতার প্রেতমূর্তি। হ্যামলেট পিতার সেই প্রেতমূর্তির সাথে সাক্ষাৎ করতে আসে। সেই প্রেতমূর্তি তাকে বলে তার বাগানে ঘুমানোর সময় তারই ভাই (হ্যামলেটের কাকা) কানের মধ্যে বিষ ঢেলে দেয় আর তাতেই তার মৃত্যু হয়। হ্যামলেট যেন এই মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়।

হ্যামলেট বুঝতে পারে তার পিতাকে হত্যা করা হয়েছে। সে উন্মাদের মতো হয়ে ওঠে। তার প্রিয়তমা ওফেলিয়ার সাথে পর্যন্ত এমন আচরণ করে, যা তার স্বভাববিরুদ্ধ। নিজের অজান্তে ওফেলিয়ার পিতা পলোনিয়াসকে হত্যা করে। মানসিক আঘাতে বিপর্যস্ত ওফেলিয়া আত্মহত্যা করে। আর হ্যামলেট আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হতে থাকে। সে শুধু তার পিতার হত্যাকারীকেই হত্যা করতে চায় না, সে চায় রাজপ্রাসাদের সব পাপ কলুষতা দূর করতে। ষড়যন্ত্রের জাল চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। হ্যামলেটের কাকা তাকে বিষ প্রয়োগ করে হত্যা করতে চায় কিন্তু সেই বিষ পান করে মারা যান হ্যামলেটের মা। ক্রুদ্ধ হ্যামলেট তরবারির আঘাতে হত্যা করে কাকাকে। কিন্তু নিজেও বিষাক্ত ছুরির ক্ষতে নিহত হয়।

হ্যামলেটের এই মৃত্যু এক বেদনাময় গভীর অনুভূতির স্তরে নিয়ে যায়।

শেষ লেখা-শেক্সপিয়রের শেষ পর্যায়ের লেখাগুলো ট্র্যাজেডি বা কমেডি থেকে ভিন্নধর্মী। রোমাঞ্চ, মেলোড্রামা, বিচিত্র কল্পনার এক সংমিশ্রণ ঘটেছে এসব নাটকে। সিমবেলিন, উইন্টার্সটেল, টেমপেস্ট তার উল্লেখযোগ্য নাটক

প্লেটো

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ১০০ মনীষীর জীবনী থেকে

সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল-মানুষের চিন্তা আর জ্ঞানের জগতে তিন উজ্জ্বল নক্ষত্র। সক্রেটিসের মধ্যে যে চিন্তার উন্মেষ ঘটেছিল; প্লেটো, অ্যারিস্টটল তাকেই সুসংহত দর্শনের রূপ দিলেন। এরা শুধু যে গ্রিসের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক তাই নয়, সমগ্র ইউরোপের জ্ঞানের জগতে যুগপুরুষ।

প্লেটো ছিলেন সেই সব সীমিত সংখ্যক মানুষের একজন যারা ঈশ্বরের অকৃপণ করুণা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন-তার জন্ম হয়েছিল সমভ্রান্ত ধনী পরিবারে। অপরূপ ছিল তার দেহলাবণ্য, সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা, জ্ঞানের প্রতি আকাঙ্ক্ষা, সক্রেটিসের মতো গুরুর শিষ্যত্ব লাভ করা, সবকিছুতেই তিনি ছিলেন সৌভাগ্যবান।

পিতা ছিলেন এথেন্সের বিশিষ্ট ব্যক্তি। কিন্তু আভিজাত্যের কৌলীন্য তাকে কোনো দিন সপর্শ করেনি। রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তিনি বরাবরই ছিলেন উদাসীন। বাস্তব জীবনের জটিলতা, সমস্যার চেয়ে জ্ঞানের সীমাহীন জগৎ তার মনকে আরো বেশি আকৃষ্ট করত। ছেলেবেলা থেকেই তিনি ছিলেন ভাবুক আর কল্পনাপ্রবণ। এক সময় এথেন্স সর্ববিষয়ে সমৃদ্ধ ছিল। প্লেটো যখন কিশোর সেই সময় সিসিলির সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এথেন্স। এই যুদ্ধের পর থেকেই শুরু হলো এথেন্সের বিপর্যয়। দেশে গণতন্ত্র ধ্বংস করে প্রতিষ্ঠিত হলো স্বৈরাচারী শাসন। সমাজের সর্বক্ষেত্রে দেখা দিল অবক্ষয় আর দুর্নীতি।

প্লেটো বিভিন্ন শিক্ষকের কাছে শিক্ষা লাভ করেছেন। তাদের কারো কাছে শিখেছেন সঙ্গীত, কারো কাছে শিল্প, কেউ শিখিয়েছেন সাহিত্য আবার কারো কাছে পাঠ নিয়েছেন বিজ্ঞানের। সক্রেটিসের প্রতি ছেলেবেলা থেকেই ছিল প্লেটোর গভীর শ্রদ্ধা। সক্রেটিসের জ্ঞান, তার শিক্ষাদানের পদ্ধতির প্রতি কিশোর বয়সেই আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন। কুড়ি বছর বয়সে তিনি সক্রেটিসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন।

তরুণ প্লেটো অল্পদিনের মধ্যেই হয়ে উঠলেন সক্রেটিসের সবচেয়ে প্রিয় শিষ্য। গুরুর বিপদের মুহূর্তেও প্লেটো ছিলেন তার নিত্যসঙ্গী।

বিচারের নামে মিথ্যা প্রহসন করে সক্রেটিসকে হত্যা করা হলো। সক্রেটিসের মৃত্যু হলো কিন্তু তার প্রজ্ঞার আলো জ্বলে উঠল শিষ্য প্লেটোর মধ্যে। প্লেটো শুধু যে সক্রেটিসের প্রিয় শিষ্য ছিলেন তাই নয়, তিনি ছিলেন গুরুর জ্ঞানের ধারক-বাহক। গুরুর প্রতি এত গভীর শ্রদ্ধা খুব কম শিষ্যের মধ্যেই দেখা যায়। প্লেটো যা কিছু লিখেছেন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তার প্রধান নায়ক সক্রেটিস। এর ফলে উত্তরকালের মানুষদের কাছে একটা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। সক্রেটিসকে কেন্দ্র করে প্লেটো তার সব সংলাপ তত্ত্বকথা প্রকাশ করেছেন। সব সময়ই প্লেটো নিজেকে আড়ালে রেখেছেন, কখনোই প্রকাশ করেননি। সক্রেটিসের জীবনের অন্তিম পর্যায়ের যে অসাধারণ বর্ণনা করেছেন প্লেটো তার 'সক্রেটিসের জীবনের শেষ দিন' গ্রন্থে, জগতে তার কোনো তুলনা নেই।

প্লেটোর মতো প্রতিভাবান পুরুষ যে শুধুমাত্র সক্রেটিসকে অন্ধ অনুসরণ করে তার অভিমতকেই প্রকাশ করেছেন এ কথা মেনে নেয়া কষ্টকর। তার কথোপকথনগুলো দীর্ঘকাল ধরে রচনা করা হয়েছে। প্লেটোর মতো একজন মহান চিন্তাবিদ, দার্শনিক, সমস্ত জীবন ধরে শুধু সক্রেটিসের বাণী প্রচার করবেন, একথা কখনোই মেনে নেয়া যায় না। তাই পণ্ডিত ব্যক্তিদের ধারণা, প্লেটো তার নিজের অভিমতকেই প্রকাশ করেছেন। তার এই সব অভিমতের উৎস ও প্রেরণা হচ্ছে সক্রেটিসের জীবন ও তার বাণী।

গুরুর মৃত্যুতে গভীরভাবে মর্মাহত হয়েছিলেন প্লেটো। তার কয়েক বছরের মধ্যেই এথেন্স সপার্টার হাতে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হলো। আর এথেন্সে থাকা নিরাপদ নয় মনে করে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি যখন যে দেশেই গিয়েছেন সেখানকার জ্ঞানী-গুণী-পণ্ডিতদের সাথে নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন। এতে একদিকে যেমন তার দৃষ্টিভঙ্গি, জ্ঞানের প্রসার ঘটেছিল, অন্যদিকে তেমনি পণ্ডিত দার্শনিক হিসেবে তাঁর খ্যাতি সমমান একটু একটু করে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। কয়েক বছরের মধ্যেই তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। দীর্ঘ দশ বছর ধরে প্রবাস জীবন কাটিয়ে অবশেষে ফিরে এলেন এথেন্সে।

মহান গুরুর মহান শিষ্য। ভ্রমর যেমন ফুলের সুবাসে চারদিক থেকে ছুটে আসে দলে দলে, ছাত্ররা এসে ভিড় করল প্লেটোর কাছে। সক্রেটিস শিষ্যদের নিয়ে প্রকাশ্য স্থানে গিয়ে শিক্ষা দিতেন কিন্তু প্লেটো উন্মুক্ত কল-কোলাহলে শিক্ষাদানকে মেনে নিতে পারতেন না।

নগরের উপকণ্ঠে প্লেটোর একটি বাগানবাড়ি ছিল, সেখানেই তিনি শিক্ষাকেন্দ্র খুললেন, এর নাম দিলেন একাডেমি। এই একাডেমির ছাত্রদের কাছেই প্লেটো উজাড় করে দিলেন তার জ্ঞান চিন্তা মনীষা। তার জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, সিসিলি দ্বীপের শাসকদের আহ্বানে তিনি উপদেষ্টা হিসেবে সেখানে যান। তিনি চেয়েছিলেন সিসিলিকে এক আদর্শ রাষ্ট্র হিসেবে গঠন করতে। দার্শনিকদের চিন্তা-ভাবনার সাথে রাষ্ট্রনেতাদের চিন্তা-ভাবনার কোনো দিনই মিল হয় না। তাই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে এলেন এথেন্সে। তার এই অভিজ্ঞতার আলোকে লিখলেন রিপাবলিক-এক আদর্শ রাষ্ট্রের রূপ ফুটে উঠেছে সেখানে। আসলে প্লেটোর আগে দর্শনশাস্ত্রের কোনো শৃঙ্খলা ছিল না। তিনিই তাকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করলেন। তাকে নতুন ব্যঞ্জনা দিলেন। তিনি জীবনব্যাপী সাধনার মধ্যে দিয়ে মানুষকে দিয়েছেন এক নতুন প্রজ্ঞার আলো। ইউরোপ তাকে বর্জন করলেও আরবরা তাকে গ্রহণ করল। আরব পণ্ডিতরা তাকে নতুনভাবে আবিষকার করল। আবার চারদিকে প্রচারিত হলো তার আদর্শবাদ। ইউরোপের মানুষের চিন্তা-ভাবনার মননের জগতে যে দুজন মানুষ সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তাদের একজন প্লেটো, অপরজন অ্যারিস্টটল।

প্লেটোর চিন্তা-ভাবনা তার যুগকে অতিক্রম করে হয়ে উঠেছে এক চিরকালীন সত্য। প্লেটোর চিন্তা-ভাবনার পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে তার রিপাবলিক গ্রন্থে। বিশ্বসাহিত্যের এক অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। যদিও বইখানিতে মূলত রাষ্ট্রনীতির আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু রাষ্ট্রনীতির প্রয়োজনে এখানে নানা প্রসঙ্গ এসেছে। মানব জীবন এবং সমাজ জীবনে যা কিছু প্রয়োজন-শরীরচর্চা, শিল্পকলা, সাহিত্য, শিক্ষা, এমনকি সুপ্রজননবিদ্যা-এছাড়া কাব্য অলঙ্কার নন্দনতত্ত্ব এই বইয়ের অন্তর্ভুক্ত। প্লেটো রাষ্ট্রের নাগরিকদের তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন-(১) শাসক সম্প্রদায় (২) সৈনিক (৩) জনসাধারণ ও ক্রীতদাস। রাষ্ট্র তখনই সুপরিচালিত হয় যখন তিন বিভাগের কাজের মধ্যে সুসামঞ্জস্য বর্তমান থাকে এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে। তিনি বলেছেন, শাসক সম্প্রদায়ের প্রয়োজন জ্ঞান, শাসন ক্ষমতা-সৈনিকদের চাই সাহস, বীরত্ব, জনগণের প্রয়োজন সংযম ও শাসকদের প্রতি আনুগত্য। রাষ্ট্রের উন্নতি-অবনতি অনেকাংশে নির্ভর করে শাসকদের ওপর। তাই প্লেটো সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন শাসক নির্বাচনের ওপর।

তিনি বিশ্বাস করতেন রাষ্ট্রক্ষমতায় কোনো স্বৈরাচারীর স্থান নেই। 'রাষ্ট্রের অস্তিত্ব শুধু জীবন ধারণের জন্য নয়। যত দিন মানুষ জীবিত থাকবে তত দিনই সে শ্রেষ্ঠ জীবন যাপন করবে।' তার রাষ্ট্রব্যবস্থায় উচ্চ-নিচের ভেদ থাকবে না, থাকবে পারসপরিক সৌহার্দ ও প্রীতির সম্পর্ক। দি লস গ্রন্থে তিনি বলেছেন, নগরবাসীরা সকলে পরসপরকে জানবে বুঝবে। এর চেয়ে ভালো ব্যবস্থা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আর কিছুই হতে পারে না।

সুপ্রজননবিজ্ঞান-প্রাচীন গ্রিসের মানুষরা সুস্থ সবল দেহের ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিত। তারা দুর্বল অসুস্থ শিশুকে জীবিত রাখার পক্ষপাতী ছিল না। প্লেটো এই অভিমত সমর্থন করতেন। তাই তিনি বলেছেন, যাদের শরীর ব্যাধিগ্রস্ত তাদের কোনো সন্তান প্রজনন করা উচিত নয়। আপাত দৃষ্টিতে প্লেটোর অভিমত নিষ্ঠুর বলে মনে হলেও সামাজিক বিচারে তা একেবারে মূল্যহীন নয়। সঙ্গীতের প্রতি প্লেটোর ছিল গভীর আকর্ষণ। তিনি বিশ্বাস করতেন সঙ্গত মানব জীবনকে পূর্ণতা দেয়, মানবিক গুণকে বিকশিত করে।

নারীদের প্রতি প্লেটোর ছিল গভীর শ্রদ্ধা। তাদের শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি উদার নীতিতে বিশ্বাস করতেন। সেই যুগে অনেক মহিলাই পুরুষের যোগ্য সঙ্গিনী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি মনে করতেন পুরুষরা অহমিকাবশত নারীদের উপেক্ষা করে। গ্রিসের পুরুষদের এই অহমিকা প্লেটোকে সপর্শ করেনি। তিনি দেখেছেন বিভিন্ন গ্রিক মনীষীর প্রেরণার উৎসই হচ্ছে নারী।

প্লেটো তার সমস্ত শিক্ষার মধ্য দিয়ে এক আদর্শ রাষ্ট্র, মানব সমাজ গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। জীবনের অন্তিম পর্বে এসে বাস্তবের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে উপলব্ধি করেছিলেন, রিপাবলিকের মধ্যে তিনি যে রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছেন তা কোনো দিনই বাস্তব হওয়া সম্ভব

নয়। তাই তিনি লিখলেন তার আইন গ্রন্থ। এতে মানুষের বাস্তব প্রয়োজন, তার কল্যাণের কথা চিন্তা করে রাষ্ট্রের আদর্শের কথা বলেছেন।

দার্শনিক প্লেটোর আরেক দিক তার কবিসত্তা। তার প্রবন্ধগুলোর মধ্যে একদিকে যেমন প্রকাশ পেয়েছে জ্ঞান, গভীরতা, প্রজ্ঞা, অন্যদিকে ফুটে উঠেছে অনুপম লালিত্য। দর্শনের ভাষা যে এমন প্রাণবন্ত, কাব্য সৌন্দর্যে অতুলনীয় হয়ে উঠতে পারে, প্লেটোর রচনা না পড়লে তা অনুভব করা যায় না। প্লেটো কবিদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না কিন্তু তার রচনার মধ্যে কবি আর দার্শনিক সত্তা মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল।

তাই তার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক রাসেল বলেছেন, 'প্লেটো শুধু ভাবুক ছিলেন না-ছিলেন কলাকুশলী। তার প্রতিটি রচনাই সাহিত্যিক নিপুণতার এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন। কোথাও তার রচনা নাটকীয়, কোথাও ঐতিহাসিক ঘনঘটায় আচ্ছন্ন। ভোরের আলোছায়ার মতো তার রচনায় হাস্যরস, গাম্ভীর্য, করুণ রস একই সাথে পরসপরকে অনুগমন করেছে। বিষয় বৈচিত্র্যে রচনাশৈলীর সৌন্দর্য আর বিশুদ্ধতায় প্লেটোর নাম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যস্রষ্টাদের পাশে অমর হয়ে থাকবে।'

প্লেটো ছিলেন একেশ্বরবাদী। তার ঈশ্বর মঙ্গলময়, তিনি মানুষের কল্যাণ করেন। তিনি পূজা পাঠ উপাসনাকে স্বীকার করেননি। তিনি বিশ্বাস করতেন শ্রদ্ধা আর পবিত্র চরিত্র। সেই সাথে প্রজ্ঞা, জ্ঞানের মাধ্যমেই ঈশ্বরের পূজা করতে হয়।

একদিন তার এক বন্ধুর ছেলের বিয়েতে নিমন্ত্রিত হয়ে গিয়েছিলেন। সেখানকার কলকোলাহলে কিছুক্ষণের মধ্যেই ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। বিশ্রাম নেয়ার জন্য পাশের ঘরে গেলেন কিন্তু আনন্দ উল্লাসের শব্দ ক্রমশই বেড়ে চলছিল। উপস্থিত সকলেই ভুলে গিয়েছিল বৃদ্ধ দার্শনিকের কথা। এক সময় বিবাহ শেষ হলো। নব দম্পতি আশীর্বাদ গ্রহণের জন্য প্লেটোর কক্ষে প্রবেশ করল। প্লেটো তখন গভীর ঘুমে অচেতন। পৃথিবীর কোনো মানুষের ডাকেই সে ঘুম ভাঙবে না।

স্যার আইজাক নিউটন

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ১০০ মনীষীর জীবনী থেকে

১৬৪২ সালের বড়দিনে আইজাক নিউটন জন্মগ্রহণ করেন। তার জন্মের কয়েক মাস আগেই পিতার মৃত্যু হয়। জন্মের সময়ে আইজাক ছিলেন দুর্বল শীর্ণকায় আর ক্ষুদ্র আকৃতির, দাই তাঁর জীবনের আশা সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছিলেন। হয়তো বিশ্বের প্রয়োজনেই বিশ্ববিধাতা তাঁর প্রাণরক্ষা করেছিলেন।

বিধবা মায়ের সাথেই নিউটনের জীবনের প্রথম তিন বছর কেটে যায়। এই সময় তার মা বারনাবাস নামে ভদ্রলোকের প্রেমে পড়ে তাকে বিবাহ করেন। নব বিবাহিত দম্পতির জীবনে শিশু নেহাতই অবাঞ্ছিত বিবেচনা করে মা শিশু নিউটনকে তার দাদির কাছে রেখে দেন।

১২ বছর বয়সে নিউটনকে গ্রামের স্কুলে ভর্তি করে দেয়া হলো। জন্ম থেকেই রুগ্ন ছিলেন নিউটন। তবু তার দুষ্টুমি কিছু কম ছিল না। কিন্তু শিক্ষকরা তার অসাধারণ মেধার জন্য সকলেই তাকে ভালোবাসতেন।

স্কুলের অধ্যক্ষ প্রায়ই স্কুলে পৌঁছাতে দেরি করত। একদিন নিউটন বললেন, স্যার, আমি আপনার জন্য একটা ঘড়ি তৈরি করে দিচ্ছি, তাহলে ঘড়ি দেখে ঠিক সময়েই স্কুলে আসতে পারবেন। নিউটন ঘড়ি তৈরি করলেন। ঘড়ির উপরে থাকত একটা পানির

পাত্র। প্রতিদিন নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি সেই পাত্রে ঢেলে দেয়া হতো। তার থেকে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঘড়ির কাঁটার ওপর পড়ত এবং ঘড়ির কাঁটা আপন গতিতেই এগিয়ে চলত।

ভাগ্যের পরিহাসে নিউটনের সৎ বাবা মারা গেলেন। মার একার পক্ষে ক্ষেত জমিজমা দেখাশোনা করা সম্ভব হলো না। স্কুল ছাড়িয়ে চৌদ্দ বছরের নিউটনকে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে এলেন।

ভাগ্যক্রমে চাচা উইলিয়াম ভাইপোর জ্ঞানতৃষ্ণায় মুগ্ধ হয়ে নিজের কাছে নিয়ে এলেন। চাচা কেমব্রিজের ট্রিনাটি কলেজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনিই ভাইপোকে আবার স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। এক বছর পর নিউটন ট্রিনিটি কলেজে ভর্তি হলেন। শুরু হলো এক নতুন জীবন।

ছাত্র হিসেবে নিউটন ছিলেন যেমন অধ্যবসায়ী, পরিশ্রমী তেমনি অসাধারণ মেধাসম্পন্ন। তার সবচেয়ে বেশি দখল ছিল অঙ্কে। যে কোনো জটিল অঙ্কের সমাধান সহজেই করে ফেলতেন। তবুও অঙ্কের প্রতি তার কোনো আকর্ষণ ছিল না। প্রকৃতির দুর্জ্ঞেয় রহস্য তাকে সবচেয়ে বেশি মুগ্ধ করত। নিউটন বিশ্বাস করতেন একমাত্র বিজ্ঞানের মাধ্যমেই প্রকৃতির এই গোপন রহস্যকে উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব। অবশেষে ১৬৬৫ সালে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করলেন।

কলেজে ছাত্র থাকাকালীন অবস্থাতেই তিনি অঙ্কশাস্ত্রের কিছু জটিল তথের আবিষকার করেন-বাইনমিয়াল থিওরেম (Binomial theorem) ফ্লাক্সসন (Fluxions) যা বর্তমানে ইন্টিগ্রাল ক্যালকুলাস (Interegal Calculas) নামে পরিচিত। এ ছাড়া কঠিন পদার্থের ঘনত্ব (The method for Calculating the area of curves or the volume of solids)। ১৬৬৬ সালএই সময় - পদ্ধ... নিউটন একটি চিঠিতে লিখেছেন আমিতি উদ্ভাবনের সাথে সাথেই মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করতে শুরু করেছি। ভাবতে অবাক লাগে তখন নিউটনের বয়স মাত্র চব্বিশ।

নিউটন চাঁদ ও অন্য গ্রহ-নক্ষত্রের গতি নির্ণয় করতে সচেষ্ট হন। কিন্তু তার উদ্ভাবিত তত্ত্বের মধ্যে কিছু ভুল-ত্রুটি থাকার জন্য তার প্রচেষ্টা অসম্পূর্ণ ও ভুল থেকে যায়।

এই সব অসাধারণ কাজ ও মৌলিক তত্ত্বের জন্য সেই তরুণ বয়সেই নিউটনের খ্যাতি পণ্ডিত মহলে ছড়িয়ে পড়ল। ১৬৬৭ সালে তাঁর কৃতিত্বের জন্য ট্রিনিটি কলেজ তাকে ফেলো হিসেবে নির্বাচন করল। একজন ২৫ বছরের তরুণের পক্ষে এ এক দুর্লভ সমমান।

এবার তিনি আলোর প্রকৃতি ও তার গতিপথ নিয়ে গবেষণার কাজ শুরু করলেন এবং এই কাজের প্রয়োজনেই তিনি তৈরি করলেন প্রতিফলক টেলিস্কোপ। পরবর্তীকালে মহাকাশসংক্রান্ত গবেষণার প্রয়োজনে যে উন্নত ধরনের টেলিস্কোপ আবিষকৃত হয় তিনিই তার অগ্রগামী পথিক।

নিউটন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রিনিটি কলেজের গণিতের অধ্যাপক হিসেবে নির্বাচিত হলেন। সেই সাথে আলোর বর্ণচ্ছটা নিয়ে গবেষণার কাজ আরম্ভ করেন। ইংল্যান্ডের রয়াল সোসাইটিও নিউটনের বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে মুগ্ধ হয়ে তাকে সোসাইটির সদস্য নির্বাচিত করলেন। তখন তার বয়স মাত্র ২৯ বছর। ইংল্যান্ডের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের পাশে তার স্থান হলো। সোসাইটির প্রথম সভায় তার আলোকতত্ত্ব নিয়ে প্রবন্ধ পাঠ করলেন। তার বিষয়বস্তুর সঙ্গে একমত হতে না পারলেও সোসাইটির সমস্ত বিজ্ঞানীই উচ্চকণ্ঠে তার বৈজ্ঞানিক নিবন্ধের প্রশংসা করলেন। তিনি যেন এক আত্মমগ্ন সাধক। নিজের স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছেন। নিজের বেশবাস সাজগোজ কোনো দিকেই ভ্রূক্ষেপ নেই। প্রায়ই দেখা যেত তিনি কলেজে আসছেন, তাঁর জামার বোতাম খোলা, পায়ের মোজা গুটিয়ে আছে, এলোমেলো চুল। তন্ময় হয়ে চলেছেন কোনো নতুন বৈজ্ঞানিক ভাবনায় বিভোর।

কল্পনাপ্রবণ এই মনের জন্যই বাস্তব জগৎ সম্বন্ধে তার ধারণা ছিল অসপষ্ট। একদিন একজন লোক তার বাড়িতে এসে একটা প্রিজম (তিনকোণা কাচপ্রিজমের বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব বিবেচনা করে নিউটন ?দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল এর কত দাম হতে পারে (এর মূল্য নির্ণয় করা আমার সাধ্যের বাইরে। ,বললেন

লোকটি নিউটনের কথা শুনে অস্বাভাবিক বেশি দামে প্রিজমটি বিক্রি করতে চাইল। কোনো দরদাম না করেই সেই দামে প্রিজমটি কিনে নিলেন নিউটন। নিউটনের বাড়িওয়ালা সব কথা শুনে বললেন, তুমি নেহাতই বোকা। এটা সাধারণ একটা কাচ, এই কাচের যা ওজন হবে সেই দামেই এটা কেনা উচিত ছিল।

নিউটন কোনো কথা না বলে শুধু হাসলেন। পরবর্তীকালে এই প্রিজম থেকেই উদ্ভাবন করেন বর্ণতত্ত্ব (theory of colour)।

কলেজের ছুটির অবকাশে মায়ের কাছে গিয়েছেন নিউটন। দিনের বেশির ভাগ সময়ই বাগানের মধ্যে বসে থাকেন। প্রাণ ভরে উপভোগ করেন প্রকৃতির রূপ রস গন্ধ। একদিন হঠাৎ সামনে খসে পড়ল একটা আপেল। মুহূর্তে তার মনের কোণে উঁকি মারে এক জিজ্ঞাসা-কেন আপেলটি আকাশে না উঠে মাটিতে এসে পড়ল? এই জিজ্ঞাসাই মানুষের চিন্তার জগতে এক যুগান্তর নিয়ে এলো। জন্ম নিল মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বের। যদিও এই চিন্তার সূত্রপাত হয়েছিল বহু পূর্বেই। তার পূর্ণ পরিণতি ঘটল ১৬৮৭ সালে। নিউটন প্রকাশ করলেন তার কালজয়ী গ্রন্থ (Mathemtical Principles of Natural Philosophy)। মানুষ মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কথা সামান্য কিছু জানলেও এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে রয়েছে যে তার অস্তিত্ব সে কথা কেউ জানতে না। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির এই আকর্ষণ গ্রহ নক্ষত্র পৃথিবীকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে।

একদিন রাতে এক বন্ধুর বাড়িতে তার নিমন্ত্রণ হয়েছে। কাজ করতে করতে রাত হয়ে গেছে। হঠাৎ তার মনে পড়ল বন্ধুর বাড়িতে যেতে হবে। তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বের হলেন নিউটন। যখন বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে পৌঁছলেন তখন গভীর রাত। চারদিক অন্ধকার। নিউটন বুঝতে পারলেন নিমন্ত্রণ পর্ব আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। বাড়ি ফিরে এসে আবার কাজে বসলেন। রাতে খাওয়ার কথা মনেই হলো না তার।

এই নিরলস গবেষণার মধ্যে দিয়েই নিউটন প্রমাণ করলেন, If the force varied as the inverse square, the orbit would be an elipse with the centre of the force in one focus -এই আবিষকারের মাধ্যমে মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার কাজ সহজসাধ্য হলো। এত দিন মানুষের জানা ছিল না চন্দ্র-সূর্যের সঠিক আয়তন। নিউটন তা নির্ণয় করলেন।

প্রতিষ্ঠা হলো মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব-এই তত্ত্বের যাবতীয় বিবরণ তিনি লিখলেন তার প্রিন্সিপিয়া গ্রন্থটিতে (Principia Mathematica)। যখন এই বই প্রকাশিত হলো তখন অধিকাংশ মানুষের কাছেই মনে হলো এই বই যেমন জটিল তেমনি দুর্বোধ্য। নিউটনের এক দার্শনিক বন্ধু একদিন নিউটনকে জিজ্ঞাসা করলেন, কীভাবে তোমার লেখার অর্থ বোঝা সম্ভব।

নিউটন তাকে একটি বইয়ের তালিকা দিয়ে বললেন, আপনি আগে এই বইগুলো পড়ুন তাহলে আমার তত্ত্ব বোঝার কাজ সহজ হবে। ভদ্রলোক তালিকাটি দেখে বললেন, নিউটনের তত্ত্ব বোঝা আমার সাধ্যের বাইরে। কারণ প্রাথমিক তালিকার এই কটি বই পড়া শেষ করতেই আমার অর্ধেক জীবন কেটে যাবে।

Philosophiac naturalis Principia Mathematica প্রকাশিত হয় ১৬৪৭ সালে। ল্যাটিন ভাষায় লেখা এই বইটি তিনটি খণ্ডে বিভক্ত।

প্রথম খণ্ডে নিউটন গতিসূত্র সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। তিনটি গতিসূত্র হলো (১) প্রত্যেকটি বস্তু চিরকাল সরলরেখা অবলম্বন করে সমবেগে চলতে থাকে। (২) বস্তুর ওপর প্রযুক্ত বল বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হারের সমানুপাতিক এবং বল যেদিকে ক্রিয়া করে, ভরবেগের পরিবর্তনও সেদিকে ঘটে। (৩) প্রত্যেকটি ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে।

প্রিন্সিপিয়া গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি গ্যাস, ফ্লুইড বস্তুর গতির কথা আলোচনা করেছেন। গ্যাসকে কতকগুলো স্থিতিস্থাপক অণুর সমষ্টি ধরে নিয়ে তিনি বয়েলের সূত্র প্রমাণ করেন। গ্যাসের ওপর চাপের প্রভাব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পরোক্ষভাবে শব্দ তরঙ্গের গতিবেগও নির্ধারণ করেন। তাঁর এই তত্ত্বে কিছু ভুল-ত্রুটি ছিল। উত্তরকালে অন্য বিজ্ঞানীরা এসব ভুল-ত্রুটি সংশোধন করেন।

তৃতীয় খণ্ডে মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্ব সম্বন্ধে খুঁটিনাটি আলোচনা করেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবেই সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহগুলো ঘুরছে। তেমনি পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে চাঁদ। দুটি বস্তুর মধ্যে মহাকর্ষীয় বল তাদের ভরের সমানুপাতিক ও দূরত্বের বর্গের ব্যস্তানুপাতিক। পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব পৃথিবীর ব্যাসার্ধের ৬০ গুণ। এই দূরত্ব থেকে চাঁদ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে। নিউটন লক্ষ করেছিলেন সূর্য ও গ্রহগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটি গ্রহ ও তাদের উপগ্রহগুলোর মধ্যে পৃথিবীর সমুদ্র ও চাঁদ এবং সূর্যের মধ্যে এমনকি জোয়ার-ভাটা ও সাধারণভাবে জগতের যে কোনো দুটি বস্তুর মধ্যে একই মহাকর্ষ তত্ত্ব কার্যকর। এছাড়া তিনি আরো একটি সমস্যার সমাধান করেছিলেন। তিনি প্রমাণ করলেন একটি সমরূপ গোলাকার বস্তুর ভেতরের প্রতিটি কণা যদি বাইরের একটি কণাকে মাধ্যাকর্ষণ বলের সূত্র অনুসারে আকর্ষণ করে তাহলে বাইরের কণাটির ওপর যে বল কাজ করবে সেটি এমন হবে যেন গোলাকার বস্তুটির সমস্ত ভর তার কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত।

তার প্রতি সমালোচনা করা হলো তিনি তার তত্ত্বে বিশ্বপ্রকৃতিকে যেভাবে বিবেচনা করেছেন তা থেকে মনে হয় এ সমস্তই যেন এক বিশৃঙ্খল মনের প্রাণহীন সৃষ্টির কাহিনী।

নিউটন তার জবাবে বললেন, প্রকৃতপক্ষে এই বিশ্বপ্রকৃতি এমন সুশৃঙ্খল সুসামঞ্জস্যভাবে সৃষ্টি হয়েছে মনে হয় এর পশ্চাতে কোনো ঐশ্বরিক স্রষ্টা রয়েছেন।

নিউটনের এই বিচিত্র মানসিকতার জন্য কোনো মানুষই তাকে সহজভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি। হয়তো নিজেই নিজের বিরাটত্বকে সঠিকভাবে চিনতে পারেননি। অসাধারণ আবিষকারের পরও তিনি ছিলেন অসুখী মানুষ।

Principia প্রকাশের পরই নিউটন সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে নামলেন। যখন দ্বিতীয় জেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা কেড়ে নিতে চাইলেন, তিনি তার সক্রিয় বিরোধী হয়ে উঠলেন। রাজপরিবারের উৎখাতের পর ১৬৯৪ সালে নতুন সংবিধান তৈরির জন্য যে কনভেনশন গড়ে উঠল, নিউটন তার সদস্য হলেন।

রাজনীতিবিদ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন নিউটন। ১৬৯০ সালে কনভেনশনের পরিসমাপ্তি ঘটল, নিউটনের রাজনৈতিক জীবনেরও পরিসমাপ্তি ঘটল।

১৭০৩ সালে নিউটনের জীবনে এলো এক অভূতপূর্ব সমমান। তিনি রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি হলেন। আমৃত্যু তিনি সেই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৭০৫ সালে রানী অ্যানি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এলেন। রানীর পক্ষ থেকে নিউটনকে নাইটহুড উপাধিতে ভূষিত করা হলো। এই সময় ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাস (Differential Calculus)-এর প্রথম আবিষকর্তা হিসেবে জার্মান দার্শনিক লিবনিজের (Leibniz/Leibnitz) সাথে বিতর্কে জড়িয়ে পড়লেন। ইংল্যান্ডের রয়্যাল একাডেমি জানতে পারে লিবনিজ Differential Calculus-এর আবিষকর্তা হিসেবে দাবি জানাচ্ছে। রয়্যাল একাডেমির সদস্যরা ক্রোধে ফেটে পড়ল। তাদের সভাপতির কৃতিত্বকে এক বিদেশী

চুরি করে নিজের নামে প্রচার করতে চাইছে। কারণ তারা বিশ্বাস করতেন নিউটনই প্রথম Calculus-এর সম্ভাবনা, তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে লিবনিজের কাছে বলেছিলেন। লিবনিজ একে উন্নত করেছে, সঠিক বিসতৃতি দিয়েছে কিন্তু আবিষকার করেনি।

তবে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকদের মতে, নিউটন ডিফারেন্সিয়াল ক্যালকুলাসের উদ্ভাবক হলেও লিবনিজের পদ্ধতি ছিল অনেক সহজ এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। ১৭২৭ সাল, নিউটন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। চিকিৎসাতে কোনো সুফল পাওয়া গেল না। অবশেষে ২০ মার্চ মহাবিজ্ঞানী নিউটন তার প্রিয় অনন্ত বিশ্বপ্রকৃতির বুকে চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেলেন। সাত দিন পর তাকে ওয়েস্ট মিনস্টার অ্যাবিতে সমাধিস্থ করা হলো।

সমস্ত দেশ অবনত মস্তকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানায় সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ এই জ্ঞানতাপসকে। যদিও নিজেকে তিনি কখনো পণ্ডিত বা জ্ঞানী ভাবেননি। মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগে তিনি লিখেছিলেন, 'পৃথিবীর মানুষ আমাকে কী ভাবে জানি না কিন্তু নিজের সম্বন্ধে আমি মনে করি আমি একটা ছোট ছেলের মতো সাগরের তীরে খেলা করছি আর খুঁজে ফিরেছি সাধারণের চেয়ে সামান্য আলাদা পাথরের নুড়ি বা ঝিনুকের খোলা। সামনে আমার পড়ে রয়েছে অনাবিষকৃত বিশাল জ্ঞানের সাগর।'

সম্রাট অশোক

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ১০০ মনীষীর জীবনী থেকে

(আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ২৩২-৩০০)

প্রতিবেশী দুটি সাম্রাজ্য মগধ এবং কলিঙ্গ। মগধ অপেক্ষাকৃত বড়, তার শক্তিও তুলনায় বেশি। তবুও মগধ সম্রাটের মনে শান্তি নেই। প্রতিবেশী এক শত্রুকে রেখে কি নিশ্চিন্ত হওয়া যায়!

দুই পক্ষের সৈন্যবাহিনীই শক্তিশালী। কিন্তু মগধের সৈন্যরা অনেক বেশি যুদ্ধপটু আর কৌশলী। কলিঙ্গের সৈন্যরা বীর বীক্রমে লড়াই করেও পরাজিত হলো। আহত আর নিহত সৈন্যে ভরে উঠল যুদ্ধক্ষেত্র। রক্তাক্ত হলো সমস্ত প্রান্তর। কলিঙ্গরাজ নিহত হলেন।

বিজয়ী মগধ সম্রাট হাতির পিঠে চেপে যেতে যেতে দেখলেন তার দুপাশে ছড়িয়ে রয়েছে কত অসংখ্য মৃতদেহ। কত আহত সৈনিক। কেউ আর্তনাদ করছে, কেউ যন্ত্রণায় কাতর হয়ে চিৎকার করছে। কেউ সামান্য একটু পানির জন্য ছটফট করছে। আকাশে মাংসের লোভে শকুনের দল ভিড় করছে।

যুদ্ধক্ষেত্রের এই বিভীষিকাময় দৃশ্য দেখে সম্রাট বিষণ্ন হয়ে গেলেন। অনুভব করলেন তার সমস্ত অন্তর ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছে। ধীরে ধীরে নিজের তাঁবুতে ফিরে দেখলেন শিবিরের সামনে দিয়ে চলেছে এক তরুণ বৌদ্ধ সন্ন্যাসী।

সন্ন্যাসী বললেন, আমি যুদ্ধক্ষেত্রে আহত সৈনিকদের সেবা করতে চলেছি।

মুহূর্তে অনুতাপের আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল সম্রাটের হৃদয়। সম্রাটের অন্তরে জ্বলে উঠল নতুন এক প্রজ্ঞার আলোক। তিনি শপথ করলেন আর যুদ্ধ নয়, আর হিংসা নয়, ভগবান বুদ্ধের করুণায় আলোয় অহিংসা মন্ত্রে ভরিয়ে দিতে হবে সমগ্র পৃথিবী। একদিন যিনি ছিলেন উন্মত্ত দানব-এবার হলেন শান্তি আর অহিংসার পূজারি প্রিয়দর্শী অশোক।

খ্রিষ্টপূর্ব ২৭২ সালে বিন্দুসারের মৃত্যুর পর পুত্রদের মধ্যে সিংহাসনের অধিকার নিয়ে বিবাদ শুরু হচ্ছিল। বিন্দুসারের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম সুধীন, দ্বিতীয় পুত্র অশোক। সুধীন ছিলেন উদ্ধত বিলাসী। অশোক ছিলেন হৃদয়হীন নিষ্ঠুর প্রকৃতির। ভাইকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করলেন। অশোকের পরের ভাইয়ের নাম ছিল তিষ্য। অশোক অনুভব করলেন তিনি জ্যেষ্ঠ ভাইকে হত্যা করে সিংহাসনে বসেছেন, এতে রাজ্যের অনেকেই ক্ষুব্ধ। তার ওপর যদি তিষ্যকে হত্যা করেন প্রজারা বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে। তাই তাকে পাঠিয়ে দিলেন তক্ষশীলায় সেখানকার শাসনকর্তা করে।

সর্বকনিষ্ঠ ভাইয়ের নাম ছিল বীতাশোক। ছেলেবেলা থেকেই বীতাশোক ছিলেন রাজ ঐশ্বর্য সুখভোগ বিষয়ে উদাসীন। সিংহাসনের এই অধিকার নিয়ে ভাইদের মধ্যের বিবাদ, হানাহানি তাকে আরও বিষণ্ন করে তুলল। সংসার ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন মুক্তির আশায়। বৌদ্ধ সন্ন্যাসী গিরিদত্তের কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে বৌদ্ধসঙ্গে ভিক্ষু হয়ে গেলেন।

অশোক সিংহাসনে আরোহণ করে প্রথম কয়েক বছর নিজের অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। যারা তার আনুগত্য স্বীকার করতে অস্বীকার করল, তিনি তাদের নির্মমভাবে হত্যা করলেন। তার এই নৃশংসতার জন্য লোক তাকে চণ্ডাশোক বলত।

কলিঙ্গ যুদ্ধের অল্প কিছুদিন পরেই তিনি বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। বৌদ্ধ ধর্মের প্রেম করুণায় পূর্ণ হয়ে উঠল তার হৃদয়। চণ্ডাশোক অশোক রূপান্তরিত হলেন ধর্মাশোক অশোকে।

অশোক ঘোষণা করলেন আর যুদ্ধ নয়, এবার হবে ধর্ম বিজয়। ভ্রাতৃত্ব প্রেম, করুণার মধ্যে দিয়ে অপরকে জয় করতে হবে। শুধুমাত্র নির্দেশ প্রদান করেই নিজের কর্তব্য শেষ করলেন না। এত দিন যে রাজসুখ বিলাস ব্যসনের সাথে পরিচিত ছিলেন তা পরিত্যাগ করে সরল পবিত্র জীবনযাত্রা অবলম্বন করলেন।

তিনি সকল প্রতিবেশী দেশের রাজাদের কাছে দূত পাঠিয়ে ঘোষণা করেছিলেন তিনি তাদের সাথে মৈত্রী, প্রেমের বন্ধনে আবদ্ধ হতে চান। সকলে যেন নির্ভয়ে আপন রাজ্য শাসন করেন। এমনকি সম্রাট অশোক তার উত্তরাধিকারীদের কাছেও দেশ জয়ের জন্য যুদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন। তিনি তাদের উপদেশ দিতেন অস্ত্রের মাধ্যমে নয়, প্রেম করুণা সহৃদয়তার মধ্যে দিয়েই মানুষকে জয় কর। এই জয়কে সম্রাট অশোক বলতেন ধর্ম বিজয়।

অশোক বৌদ্ধ ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। প্রধানত তারই প্রচেষ্টায় পূর্ব ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রসার লাভ করে। তবে তিনি ধর্ম প্রচারের জন্য শুধু যে রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচারকদের পাঠাতেন তাই নয়, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্তম্ভ পর্বত শিলাখণ্ডের ওপর বিভিন্ন উপদেশ উৎকীর্ণ করে দিতেন যাতে সেই অনুশাসন পাঠ করে প্রজারা তা পালন করতে পারে। অশোক এসব অনুশাসনে যে সমস্ত উপদেশ দিয়েছেন তার সাথে বৌদ্ধদের অষ্টমার্গের বিশেষ মিল নেই।

অশোকের নির্দেশে বহু পথ নির্মাণ করা হলো। এই সমস্ত পথের দুপাশে প্রধানত বট এবং আম গাছ পোঁতা হতো। যাতে মানুষ ছায়ায় পথ চলতে পারে। ক্ষুধার সময় গাছের ফল খেতে পারে। প্রতি আট ক্রোশ অন্তর পথের ধারে কূপ খনন করা হয়েছিল। শুধু মানুষ নয়, পশুদের প্রতিও ছিল তার গভীর মমতা। তিনি সমস্ত রাজ্যে পশুহত্যা শিকার নিষিদ্ধ করেছিলেন। মানব সভ্যতার ইতিহাসে তিনিই প্রথম পশুদের জন্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন। সর্বজীবের প্রতি করুণায় এমন দৃষ্টান্ত জগতে বিরল।

অশোক বৌদ্ধ হলেও অন্য কোনো ধর্মের প্রতি তার কোনো বিদ্বেষ ছিল না। সকলেই যে যার ধর্ম পালন করত। একটি শিলালিপিতে তিনি লিখেছেন, নিজের ধর্মের প্রতি প্রশংসা অন্যের ধর্মের নিন্দা করা উচিত নয়। পরস্পরের ধর্মমত শুনে তার সারবস্তু, মূল সত্যকে গ্রহণ করা উচিত।

ধর্মচরণে অধিক মনোযোগী হলেও রাজ্যশাসনের ব্যাপারে সামান্যতম দুর্বলতা দেখাননি। পিতা-পিতামহের মতো তিনিও ছিলেন সুদক্ষ প্রশাসক। সুবিশাল ছিল তার রাজ্যসীমা। তিনি শাসনকাজের ভার উপযুক্ত ব্যক্তিদের হাতেই দিতেন এবং প্রয়োজনমতো তাদের নির্দেশ দিতেন।

সম্রাট অশোক তার সমস্ত জীবন প্রজাদের সুখ কল্যাণে তাদের আত্মিক উন্নতির জন্য ব্যয় করেছিলেন। তবুও তার অন্তরে দ্বিধা ছিল। একজন সম্রাট হিসেবে তিনি কি তার যথার্থ কর্তব্য পালন করছেন? একদিন গুরুকে প্রশ্ন করলেন, গুরুদেব, সর্বশ্রেষ্ঠ দান কী?

বৌদ্ধ সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন, সর্বশ্রেষ্ঠ দান ধর্মদান। একমাত্র ধর্মের পবিত্র আলোতেই মানুষের অন্তর আলোকিত হয়ে উঠতে পারে। তুমি সেই ধর্মদান কর।

গুরুর আদেশ নতমস্তকে গ্রহণ করলেন অশোক। তারই অনুপ্রেরণায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল বৌদ্ধ ধর্মের সুমহান বাণী। কিন্তু যেখানে বৌদ্ধ ধর্মের কোনো আলো গিয়ে পৌঁছায়নি, কে যাবে সেই দাক্ষিণাত্যের, সুদূর সিংহলে?

শুধু সিংহল নয়, ভারতবর্ষের বাইরে আরও বহু দেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য লোক পাঠালেন অশোক। তিনি চেয়েছিলেন তার অহিংসা ও প্রেমের বাণী হিন্দু বৌদ্ধ ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবে।

কিন্তু সেকালের ব্রাহ্মণরা তার এই বৌদ্ধ ধর্মপ্রীতিকে ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। উপরন্তু তার এক রানিও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। তিনি ব্রাহ্মণদের সাথে গোপন ষড়যন্ত্র করতে আরম্ভ করলেন। প্রথমে অশোক কোনো কিছুই জানতেন না। কিন্তু কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর তার কাছে সমস্ত সংবাদ প্রকাশ করে দিল।

প্রচণ্ড মর্মাহত হলেন অশোক। যে আদর্শকে এত দিন তিনি লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে প্রচার করেছেন আজ নিজের স্ত্রী তার বিরোধিতা করছে। মনের দুঃখে রাজ্যপাট ত্যাগ করে বৌদ্ধবিহারে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

অশোকের অবর্তমানে তার সিংহাসনে বসলেন তার নাতি সম্পতি। তিনি বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি খুব একটা অনুরক্ত ছিলেন না। অশোকের আমলে ধর্মপ্রচারের জন্য প্রজাদের কল্যাণের জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হতো, সম্পতি সেই ব্যয় কমিয়ে দিলেন।

একদিন যিনি ছিলেন সমগ্র ভারতের সম্রাট, আজ তিনি রিক্ত। বুঝতে পারলেন পৃথিবীতে তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, এবার বিদায় নিতে হবে। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই বেদনাহত চিত্তে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন নৃপতি মহামতি অশোক।

আল ফারাবি

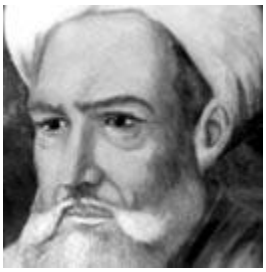

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ১০০ মনীষীর জীবনী থেকে

মুসলিম জাতির বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই তাদের অতীত ঐতিহ্য সম্পর্কে জানে না। জানার তেমন আগ্রহও নেই। আগ্রহ থাকলেও জানার তেমন কোনো পথ ও পাথেয় নেই। রাষ্ট্রশক্তিহারা মুসলমানরা তাদের অতীত ঐতিহ্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানকে ধরে রাখতে পারেনি। মুসলমানদের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা করে অমুসলিম বিশ্ব আজ উন্নত। অন্যদিকে বর্তমান মুসলিম বিশ্ব তাদের পূর্বপুরুষদের দেয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যকে হারিয়ে আজ মূর্খ ও পরনির্ভরশীল জাতিতে হয়েছে পরিণত। এমন এক যুগ ছিল যখন সমগ্র বিশ্বের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ছিল মুসলমানদের হাতে। জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য ও সভ্যতায় মুসলিম জাতি ছিল উন্নত ও শ্রেষ্ঠ। আল্লাহ পাকের আশীর্বাদে মুসলিম জাতির মধ্যে ধন্য মানুষের জন্ম হয়েছিল, যারা ছিল ঐশী জ্ঞানে মহিমান্বিত। তাদের মধ্যে এবং মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল অতীত সম্পর্কে হতভাগা মুসলমানদের অনেকেই জানে না। না জানাটাও অস্বাভাবিক নয়। কারণ মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে আজ বিকৃত করে রচনা করা হয়েছে। এছাড়া ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ মুসলিম সভ্যতাকে বিশ্ববিখ্যাত মুসলিম বিজ্ঞানী ও দার্শনিকগণের অধিকাংশের নামই বিকৃত করে লিপিবদ্ধ করেছে। তাই বর্তমান প্রজন্মের জানতে হবে তাদের গৌরবোজ্জ্বল হারানো দিনগুলো সম্পর্কে এবং বিভিন্ন মুসলিম মনীষীর দেয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান ও আবিষ্কার সম্পর্কে। অগ্নিপুরুষ সৈয়দ ইসমাঈল হোসেন সিরাজী বাঙালি মুসলমানদের চোখের সামনে তাদের গৌরবোজ্জ্বল অতীত ইতিহাস তুলে ধরার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি তার ‘স্পেন বিজয়’ কাব্যগ্রনে' যথার্থই লিখেছিলেন-

‘গাবো সে অতীত কথা, গৌরব কাহিনী,
নাচাইতে মুসলেমের নিস্পন্ধন ধমনী।
গাবো সে দুর্দম বীর্য দীপ্ত উন্মাদনা,
কৃপা করি অগ্নিময়ী করো এ রসনা।’

পৃথিবীতে মুসলমানদের উন্নতির জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আশীর্বাদ হিসেবে যুগে যুগে যে সকল মুসলিম বিজ্ঞানী ও দার্শনিককে পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন আল ফারাবি তাদের অন্যতম। তার জন্ম তারিখ কত তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তার জন্ম তারিখের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। এর অন্যতম কারণ হলো তৎকালীন যুগে কারও জন্ম তারিখ লিপিবদ্ধ করে রাখার ব্যাপারে তেমন কোনো গুরুত্ব ছিল না। যতদূর জানা যায় এ মনীষী ৮৭০ খ্রিষ্টাব্দে তুর্কিস্থানের অন্তর্গত ‘ফারাব’ নামক শহরের নিকটবর্তী ‘আল ওয়াসিজ’ নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ‘ফারাব’ নামক শহরের নামানুসারে আবু নাসের মোহাম্মদ পরবর্তীতে ‘আল ফারাবি’ নামে পরিচিত হন। বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনী পাঠ করলে দেখা যায়, অনেকেই তাদের জন্মস্থান, নিকটবর্তী শহর কিংবা দেশের নামে

পরিচিত ছিলেন। আল ফারাবির ক্ষেত্রেও তার বিপরীত ঘটেনি। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ তার নামকে বিকৃত করে 'ফারাবিয়াস' লিপিবদ্ধ করেছে। আল ফারাবির পিতা ছিলেন উচ্চশিক্ষিত এবং সেনাবাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তার পূর্বপুরুষগণ ছিলেন পারস্যের অধিবাসী। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ও রাজনৈতিক কারণে তার পূর্বপুরুষগণ পারস্য ত্যাগ করে তুর্কিস্থানে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে।

আল ফারাবি বাল্যকাল থেকেই ছিলেন জ্ঞানপিপাসু। অজানাকে জানার এবং অজেয়কে জয় করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল তার হৃদয়ে। তাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় তিনি কাটিয়ে দিয়েছেন তার সারাটা জীবন। জ্ঞানের সন্ধানে তিনি ছুটে চলেছেন দেশ থেকে দেশান্তরে। তার শিক্ষাজীবন শুরু হয় ফারাবায়। সেখানে কয়েক বছর শিক্ষা লাভের পর শিক্ষার উদ্দেশে চলে যান বোখারায়। এরপর উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য তিনি গমন করেন বাগদাদে। সেখানে তিনি সুদীর্ঘ প্রায় ৪০ বছর অধ্যয়ন ও গবেষণা করেন। কয়েকটি ভাষার ওপর ছিল তার পূর্ণ দখল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ছিলেন তিনি পারদর্শী। দার্শনিক এবং বিজ্ঞানী হিসেবে তার সুখ্যাতি আস্তে আস্তে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন কোনো শাখা বাকি ছিল না যেখানে ফারাবির প্রতিভা বিসতৃত হয়নি। কিন' তারপরও জ্ঞানের পিপাসা তার মেটেনি। জ্ঞানের অন্বেষণে তিনি ছুটে গিয়েছেন দামেস্কে, মিসরে এবং দেশ বিদেশের আরও বহু স্থানে। গবেষণা করেছেন বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা ও প্রশাখা নিয়ে। পদার্থবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, দর্শন, যুক্তিশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র, চিকিৎসাবিজ্ঞান প্রভৃতিতে তার অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। তবে বিজ্ঞান ও দর্শনে তার অবদান ছিল সর্বাধিক। পদার্থবিজ্ঞানে তিনিই 'শূন্যতার' অবস্থান প্রমাণ করেছিলেন। দার্শনিক হিসেবে ছিলেন নিয়প্লেটনিস্টদের পর্যায় বিবেচিত। বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক হিসেবে তিনি আরোহণ করেছিলেন জ্ঞানের শীর্ষে

একবার রাজা সাইফ আদ দৌলার শাহী দরবারে মনীষী আল ফারাবি উপস্থিত হন। ইতিপূর্বে রাজা বিজ্ঞানী আল ফারাবির নাম শুনেছিলেন কিন' ফারাবির সাক্ষাৎ পাননি। ফারাবিকে নিকটে পেয়ে রাজা খুব খুশি হন এবং ফারাবির সাথে জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। আলোচনায় ফারাবির জ্ঞান ও গুণাবলিতে রাজা মুগ্ধ হন এবং তাকে খুব সম্মান দেখান। বিজ্ঞানী আল ফারাবি রাজার সঙ্গী হিসেবে এখানে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন।

বিজ্ঞানী আল ফারাবি সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, দর্শন, যুক্তিশাস্ত্র প্রভৃতি বিষয়ে বহু রচনা করেছেন। কিন্তু তার রচিত গ্রন্থে'র সংখ্যা শতাধিক বলে অনেকে উল্লেখ করেছেন। এ সকল অমূল্য গ্রন্থের অধিকাংশেরই সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। তার রচিত 'আল আহলে আল মদীনা আল ফাদিলা' (দর্শন ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পর্কিত) গ্রন্থেটি সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। সমাজবিজ্ঞান সম্পর্কেও তার রচিত কয়েকটি গ্রন্থ তাকে বিখ্যাত করেছে। তিনি আজ পৃথিবীতে বেঁচে নেই। কিন' মুসলিম জাতির কল্যাণে তিনি জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে মৌলিক আবিষ্কার রেখে গেছেন তা চর্চা করলে মুসলমানরা আজও জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নতি লাভ করতে পারবে। তিনি কত সালে ইন্তেকাল করেন তা নিয়েও মতভেদ আছে। যতদূর জানা যায় তিনি ৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে ইন্তেকাল করেছিলেন।

TANBIR 01738359555

অ্যারিস্টটল

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ১০০ মনীষীর জীবনী থেকে

(খ্রিষ্টপূর্ব ৩২২-৩৮৪)

বিশ্ববিজয়ী বীর সম্রাট আলেকজান্ডার দুঃখ করে বলেছিলেন জয় করার জন্য পৃথিবীর আর কোনো দেশই বাকি রইল না। তার শিক্ষক মহাপণ্ডিত অ্যারিস্টটল সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য। জ্ঞানের এমন কোনো দিক নেই তিনি যার পথপ্রদর্শক নন। Politics তার গ্রন্থ আধুনিক রাষ্ট্রনীতির সূচনা করেছে। Politics গ্রন্থের নাট্যতত্ত্ব কাব্যতত্ত্বের ভিত্তি স্থাপন করেছে। আধুনিক জীবনবিজ্ঞানের তিনিই জনক। বহু দার্শনিক তত্ত্বের প্রবক্তা। তার চিন্তা জ্ঞান মনীষা প্রায় দুই হাজার বছর ধরে মানব সভ্যতাকে বিকশিত করেছিল।

৩৮৪ খ্রিষ্টপূর্বে থ্রেসের অন্তর্গত স্তাজেইরা শহরে অ্যারিস্টটল জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন চিকিৎসক। নাম নিকোমাকাস। শৈশবে গৃহেই পড়াশোনা করেন অ্যারিস্টটল। ১৭ বছর বয়সে পিতা-মাতাকে হারিয়ে গৃহত্যাগ করেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি এথেন্সে এসে উপস্থিত হন। সেই সময় এথেন্স ছিল শিক্ষার কেন্দ্র। সক্রেটিসের শিষ্য প্লেটো গড়ে তুলেছেন নতুন একাডেমিক। সেখানে ভর্তি হলেন অ্যারিস্টটল। অল্পদিনের মধ্যেই নিজের যোগ্যতায় তিনি হয়ে উঠলেন একাডেমির সেরা ছাত্র। প্লেটোও তার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তায় মুগ্ধ হয়েছিলেন।

শিক্ষাদান ছাড়াও নানা বিষয় নিয়ে গবেষণার কাজ করতেন অ্যারিস্টটল-তর্কবিদ্যা, অধিবিদ্যা, প্রকৃতিবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র। অল্পদিনের মধ্যেই তার গভীর জ্ঞান, অসাধারণ পাণ্ডিত্যের কথা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ম্যাসিডনের রাজা ফিলিপেরও অজ্ঞাত ছিল না। পুত্র আলেকজান্ডারের জন্ম সময়েই তার শিক্ষার ভার অর্পণ করেন অ্যারিস্টটলের ওপর। তখন অ্যারিস্টটল আটাশ বছরের যুবক।

আলেকজান্ডার যখন তেরো বছরের কিশোর, রাজা ফিলিপের আমন্ত্রণে অ্যারিস্টটল এসে তার শিক্ষার ভার গ্রহণ করলেন। শ্রেষ্ঠ গুরুর দিগ্বিজয়ী ছাত্র। বহু প্রাচীন ঐতিহাসিক ধারণা অ্যারিস্টটলের শিক্ষা উপদেশই আলেকজান্ডারের অদম্য মনোবল লৌহকঠিন দৃঢ় চরিত্র গড়ে তুলতে সাহায্য করেছিল। প্রকৃতপক্ষে একজনের ছিল সমগ্র পৃথিবীকে জয় করে তার ওপর প্রভুত্ব করার প্রবল ইচ্ছা। অন্যজনের ছিল জ্ঞানের নতুন নতুন জগৎ আবিষকার করে মানুষের জন্য তাকে চালিত করার ইচ্ছা।

অ্যারিস্টটলের প্রতি রাজা ফিলিপেরও ছিল গভীর শ্রদ্ধা। শুধু পুত্রের শিক্ষক হিসেবে নয়, যথার্থ জ্ঞানী হিসেবেও তাকে সমমান করতেন। অ্যারিস্টটলের জন্মস্থান স্তাজেইরা কিছু দুর্বৃত্তের হাতে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। সেখানকার মানুষ বন্দি জীবন যাপন করছিল। রাজা ফিলিপ অ্যারিস্টটলের ইচ্ছায় শত্রুসেনার হাত থেকে শুধু স্তাজেইরা উদ্ধার করেননি, ধ্বংসসতূপের মধ্যে থেকে শহরকে নতুন করে গড়ে তুললেন।

অ্যারিস্টটল একদিকে ছিলেন মহাজ্ঞানী, অন্যদিকে সার্থক শিক্ষক। তাই গুরুর প্রতি আলেকজান্ডারের ছিল অসীম শ্রদ্ধা। তিনি বলতেন, পিতার কাছে পেয়েছি আমার এই জীবন আর গুরুর কাছে শিক্ষালাভ করেছি কীভাবে এই জীবনকে সার্থক করা যায় তার জ্ঞান। যখন অ্যারিস্টটল জীবন বিজ্ঞানসংক্রান্ত গবেষণার কাজ করছিলেন, আলেকজান্ডার তার সাহায্যের জন্য বহু মানুষকে নিযুক্ত করেছিলেন, যাদের কাজ ছিল বিভিন্ন ধরনের মাছ, পাখি, জীবজন্তুদের জীবন পর্যবেক্ষণ করা, তার বিবরণ সংগ্রহ করে পাঠানো।

Email: tanbir_cox@yahoo.com web: http://tanbir.99k.org

দেশ-বিদেশের যেখানেই কোনো পুঁথি পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া যেত, আলেকজান্ডার যে কোনো মূল্যেই হোক সেই পুঁথি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে গুরুর হাতে তুলে দিতেন।

যখন আলেকজান্ডার এশিয়া জয়ের নেশায় সৈন্যবাহিনী নিয়ে বের হলেন, অ্যারিস্টটল ফিরে গেলেন এথেন্সে। তখন এথেন্স ছিল শিল্প সংস্কৃতি শিক্ষার পীঠস্থান। এখানেই স্কুল স্থাপন করলেন অ্যারিস্টটল। তখন তার বয়স পঞ্চাশ বছর। স্কুলের নাম রাখা হলো লাইসিয়াম। কারণ কাছেই ছিল গ্রিক দেবতা লাইসিয়ামের মন্দির।

৩২৩ খ্রিষ্টপূর্বে আলেকজান্ডারের আকস্মিক মৃত্যু হলো। এত দিন বীর ছাত্রের ছত্রছায়ায় যে জীবনযাপন করতেন তাতে বিপর্যয় নেমে এলো। কয়েকজন অনুগত ছাত্রের কাছ থেকে সংবাদ পেলেন তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। সক্রেটিসের অন্তিম পরিণতির কথা অজানা ছিল না অ্যারিস্টটলের। তাই গোপনে এথেন্স ত্যাগ করে হইরিয়া দ্বীপে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। কিন্তু এই স্বেচ্ছানির্বাসনের যন্ত্রণা বেশিদিন ভোগ করতে হয়নি অ্যারিস্টটলকে। ৩২২ খ্রিষ্টপূর্বে তার মৃত্যু হলো।

অ্যারিস্টটলের রচনা

অ্যারিস্টটল সমস্ত জীবন ধরে যে সমস্ত রচনা করে গিয়েছিলেন, মৃত্যুর আগে তা তার শিষ্য থিওফ্রাস্তোসের হাতে দিয়ে যান। থিওফ্রাস্তোর পর সেই সমস্ত রচনার উত্তরাধিকারী হন তার শিষ্য নেলেওস। নেলেওসের মৃত্যুর পর তার পুত্ররা সেই সমস্ত রচনাকে লোহার সিন্দুকে ভরে অ্যারিস্টটলের সমাধির নিচে পুঁতে রাখেন। দুশো বছর পর রোমের সেনাবাহিনী যখন গ্রিস দখল করে তখন সেই পুঁথি উদ্ধার করে রোমে নিয়ে আসা হলো। সমস্ত রচনাই জীর্ণ হয়ে গিয়েছে। বহু প্রচেষ্টায় সেই সমস্ত পুঁথির অনুলিপি প্রস্তুত করা হলো এবং তার ভিত্তিতেই অ্যারিস্টটলের রচনাবলি প্রকাশিত হয়। বিষয়বস্তু অনুসারে অ্যারিস্টটলের রচনাবলিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়-তর্কবিদ্যা, অধিবিদ্যা (Metaphysics), প্রকৃতিবিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র, অলংকারতত্ত্ব, কাব্যতত্ত্ব।

অ্যারিস্টটলের রচনার সংখ্যা এক হাজারের কাছাকাছি। তবে এর বেশির ভাগই নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সামান্য যা কিছু পাওয়া গেছে তা থেকেই অনুমান করতে অসুবিধা হয় না, কী ব্যাপক ছিল তার প্রতিভা। ভুল-ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও তিনিই প্রথম মানুষের কাছে জ্ঞানের মশালকে তুলে ধরেন।

তার রচনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মেটাফিজিকস (অধিবিদ্যা) এবং এথিক্স (নীতিশাস্ত্র)। এই বইগুলোর মধ্যে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন জীবন গতিশীল এবং ক্রমাগতই তার বিকাশ ঘটছে। এই সমস্ত রচনার মধ্যে অনেক নির্ভুল তত্ত্ব থাকলেও জ্যোতির্বিজ্ঞান ও পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে যুক্তির চেয়ে কল্পনার ও অযৌক্তিক ধারণার প্রভাবই বেশি। এর কারণ কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই এসব বিষয়ে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। যেমন তিনি বলতেন যদি একই সাথে একটি ভারী ও হালকা বস্তুকে ওপর থেকে ফেলা হয় তবে ভারী বস্তুটি আগে পড়বে। বহু শত বছর পর গ্যালিলিও প্রমাণ করলেন (পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে) দুটি বস্তুই একই সাথে মাটিতে পড়বে।

এছাড়া তিনি বিশ্বাস করতেন পৃথিবীর প্রতিটি বস্তুই স্থির। তাকে গতিশীল করার জন্য বল প্রয়োগের প্রয়োজন হয়। জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রেও অ্যারিস্টটলের অধিকাংশ মতামতই ছিল ভ্রান্ত। অ্যারিস্টটল লিখেছিলেন পৃথিবী স্থির। তাকে কেন্দ্র করে সৌরজগতের চাঁদ তারা সূর্য জ্যামিতিক পথে ঘুরছে। গ্যালিলিও প্রথম এই ধারণাকে ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করেন। তার অভিমত ছিল চাঁদের নিজস্ব আলো আছে। উত্তরকালে প্রমাণিত হয়েছে চাঁদের কোনো আলো নেই।

অ্যারিস্টটলের এসব ভ্রান্ত মতামত কয়েক শতাব্দী ধরে সমাজকে চালিত করেছে। তার জন্য অ্যারিস্টটলকে অভিযুক্ত করা যায় না। উত্তরকালের মানুষেরই দায়িত্ব ছিল তার গবেষণার সঠিক মূল্যায়ন করা। কিন্তু সে কাজে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল।

সমস্ত ভ্রান্তি থাকা সত্ত্বেও অ্যারিস্টটল মানব ইতিহাসের এক শ্রেষ্ঠতর প্রজ্ঞা-যার সৃষ্ট জ্ঞানের আলোয় মানুষ নিজেকে সমৃদ্ধ করেছে, মহত্তর পর্যায়ে উন্নীত করেছে।

লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ১০০ মনীষীর জীবনী থেকে

(খ্রিষ্টপূর্ব ১৪৫২-১৫১৯)

মানব সভ্যতার ইতিহাসে যদি পূর্ণ হিসাবে কারও নাম বিবেচনা করতে হয়, তবে একটি নাম উচ্চারণ করতে হয়, তিনি লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি। এমন বহু বিচিত্র প্রতিভার সম্মেলন সম্ভবত অন্য কোনো মানুষের মধ্যেই দেখা যায়নি।

তিনি চিত্রশিল্পী, ভাস্কর, অঙ্কশাস্ত্রবিদ, গায়ক, প্রকৃতি বিজ্ঞানী, শারীরতত্ত্ববিদ, সামরিক বিশেষজ্ঞ, আবিষ্কারক, স্টেজ ডিজাইনার, দার্শনিক। প্রতিটি বিষয়েই তিনি চেয়েছিলেন শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে এবং অনেকাংশে তিনি সফলও হয়েছিলেন। এ যেমন একদিকে তার জীবনের গৌরব, অন্যদিকে ব্যর্থতা। তিনি মানবীয় সীমায়িত শক্তি নিয়ে চেয়েছিলেন ঈশ্বরের মতো সীমাহীন হতে। তাই সাফল্যের চূড়ায় উঠেও কখনো তৃপ্তি অনুভব করেননি। মনে হয়েছে তার জীবন এক অসমাপ্ত যাত্রাপথ। যে পথের শেষ তার কাছে অগম্যই রয়ে গেল।

ইতালির রেনেসাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ দ্য ভিঞ্চি বিধাতার পরিহাসে এক কুমারী নারীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম ছিল পিয়েরো অ্যান্টনিও দ্য ভিঞ্চি। পিয়েরো ছিলেন উকিল। শৈশব থেকেই তার প্রতিভা বিকশিত হয়ে উঠেছিল। তার জীবনীকার লিখেছেন, অঙ্কে তার এত মেধা ছিল যে শিক্ষকরা তাকে পড়াত, তারা মাঝে মাঝেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ত। লিওনার্দোর অনুসন্ধিৎসা ছিল প্রবল। তার জিজ্ঞাসায় বিরক্ত হয়ে উঠত শিক্ষকরা। অঙ্ক ছাড়াও সঙ্গীতের প্রতি ছিল তার গভীর আকর্ষণ। বাঁশি বাজাতেন তিনি। পরবর্তীকালে যখন তিনি বাঁশি বাজাতেন এক স্বর্গীয় সুষমায় ভরে উঠত সমস্ত পরিমণ্ডল। তার কণ্ঠস্বরও ছিল সুমিষ্ট। তার গান শুনে সকলেই মুগ্ধ হতো।

সে যুগে চিত্রশিল্পকে কোনো সম্মানীয় হিসেবে গণ্য করা হতো না। তাছাড়া এতে ছেলের কোনো প্রতিভা আছে কিনা সে বিষয়েও পিয়েরো নিশ্চিত ছিলেন না। তাই লিওনার্দো যখন ছবি আঁকা শেখার অনুরোধ জানাল, সরাসরি তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন। লিওনার্দো উপলব্ধি করতে পারলেন বাবার অনুমতি ছাড়া ছবি আঁকা সম্ভব নয়। তাই একটি বুদ্ধি করলেন। একটা বড় কাঠের পাটাতনের ওপর গুহার ছবি আঁকলেন। গুহার মধ্যে আধো আলো আধো ছায়ার এক অপার্থিব পরিবেশ। তার সামনে এক ভয়ঙ্কর ড্রাগনের ছবি, তার মাথায় শিং। চোখ দুটো আগুনের মতো জ্বলছে। ভয়ঙ্কর হিংস্র দাঁতগুলো যেন ছুরির ফলা, নাক দিয়ে বেরিয়ে আসছে আগুনের লেলিহান শিখা।

ছবি আঁকা শেষ হতেই ঘরের মধ্যে ছবিটাকে রেখে সব জানালা বন্ধ করে দিলেন। পিয়েরো কিছুই জানেন না। ঘরে ঢোকামাত্রই সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে আতঙ্কে চিৎকার করে বেরিয়ে এলেন। পিয়েরো শান্ত হতেই লিওনার্দো গম্ভীর গলায় বললেন, আমি মনে হয় আমার যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পেরেছি।

এবার আর ছেলের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ করলেন না পিয়েরো। তিনি ছবি আঁকার অনুমতি দিলেন। সেই সময় ফ্লোরেন্সের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন ভেরক্কিয়ো। চিত্রশিক্ষার জন্য তার স্কুলে গেলেন লিওনার্দো। তখন তার বয়স আঠারো বছর।

লিওনার্দো শুধু ভেরক্কিয়োর কাছে ছবির আঙ্কিক শিক্ষা করেননি, তিনি দু চোখ মেলে দেখতে শিখেছিলেন প্রকৃতির অপরূপ রূপলাবণ্য, তার নিসর্গ শোভা, দেখেছেন নদীস্রোতের মধ্যে জীবনের প্রবাহ। তার সুখ, দুঃখ, ব্যথা-বেদনা শ্রদ্ধার গভীরে দেখেছেন নারীকে। ভেরক্কিয়োর কাছেই লিওনার্দো শিখেছিলেন কেমন করে মানব জীবনের গভীরে ডুব দিয়ে তার অপার রহস্যময়তাকে ফুটিয়ে তুলতে হয় রঙের তুলিতে। এই কারণেই লিওনার্দো ভেরক্কিয়োকেই তার গুরু হিসেবে স্বীকার করছেন। দুই বছর শিক্ষানবিশ শেষ করে লিওনার্দো স্থির করলেন নিজেই স্বাধীনভাবে শিল্পচর্চা করবেন। ফ্লোরেন্সে শিল্পীদের একটি সংঘ ছিল। তিনি তাতে নিজের নাম অন্তর্ভুক্ত করলেন।

ছবির পাশাপাশি চলছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার অধ্যয়ন। প্রকৃতপক্ষে তার মধ্যে ঘটেছিল বিজ্ঞানী আর শিল্পীর এক আশ্চর্য সংমিশ্রণ। তার চিন্তা কল্পনা অভিজ্ঞতা তার বিসতৃত বিবরণ লিখে রাখতেন খাতার পাতায়। দেখতে দেখতে দশ বছর ফ্লোরেন্সে কাটিয়ে দিলেন লিওনার্দো। এই সময় তিনি এঁকেছেন বেশ কিছু ছবি-অ্যানোনসেশন, মেরি ও যিশুর দুটি ছবি, এক রমণীয় প্রতিকৃতি।

ফ্লোরেন্সে থাকাকালীন সময়ে লিওনার্দো যে সমস্ত ছবি এঁকেছেন তার অধিকাংশই ছিল প্রচলিত শিল্পরীতির থেকে স্বতন্ত্র। তার এক শিল্পীর স্টুডিওর চার দেয়ালের মধ্যে বসেই সব ছবি আঁকতেন। লিওনার্দোই প্রথম শিল্পী যিনি প্রকৃতির ছবি আঁকার জন্য প্রকৃতির কাছে যেতেন। যা প্রত্যক্ষ করতেন তাকেই মনের রঙে রাঙিয়ে রূপ দিতেন। ছবির মধ্যে তিনিই প্রথম শেডের ব্যবহার আরম্ভ করেন।

লিওনার্দো স্থির করলেন, তিনি মিলানে যাবেন। মিলানের অধিপতি ছিলেন লুডোভিকো। ১৪৮২ সালে লিওনার্দো মিলানে এলেন। সেই সময় ফ্লোরেন্সের ডিউকের প্রাসাদে এক সঙ্গীত অনুষ্ঠনের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে লিওনার্দো তার বাঁশি বাজালেন। তার অসাধারণ সঙ্গীত প্রতিভায় মুগ্ধ হলেন ডিউক। তাকে নিজের প্রাসাদে আমন্ত্রণ করলেন। কয়েক দিনের পরিচয়েই ডিউক উপলব্ধি করতে পারলেন কী অসাধারণ প্রতিভাধর পুরুষ এই লিওনার্দো। তিনিই তাকে মিলানের অধিপতি লুডোভিকোর কাছে পত্র লিখতে অনুরোধ করলেন। লিওনার্দো লিখলেন তার সেই বিখ্যাত পত্র। এতে তিনি লিখলেন সামরিক প্রয়োজনে ৯টি মৌলিক সম্পূর্ণ নতুন আবিষ্কারের কথা।

মিলানের অধিপতি আমন্ত্রণ করে নিয়ে এলেন লিওনার্দোকে। প্রথম সাক্ষাতেই মুগ্ধ হলেন লুডোভিকো। লিওনার্দোকে নিজের রাজদরবারের অন্যতম প্রধান সভাসদ করে নিলেন। রাজপ্রাসাদেই তার থাকার আয়োজন করা হলো।

শুরু হলো লিওনার্দোর জীবনের আরেক অধ্যায়। দীর্ঘ আঠারো বছর লিওনার্দো ছিলেন মিলানে উদার হৃদয় লুডোভিকোর সাহচর্যে। এখানেই তার প্রতিভার পূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। বহুদিন ধরেই লিওনার্দো কল্পনা করতেন এক আদর্শ শহরের। যে শহর হবে সর্বাঙ্গ সুন্দর, যেখানে মানুষের প্রয়োজনীয় সমস্ত সুযোগ-সুবিধা থাকবে। রাস্তা দুই ভাগে বিভক্ত। একদিকে মানুষ, যানবাহন যাবে, অন্যদিকে আসবে। শহর হবে ছোট। তাতে ৫ হাজারের বেশি বাড়ি থাকবে না। ছোট ছোট শহর রক্ষণাবেক্ষণ করা সহজ। শহর বড় হলে লোকসংখ্যা বাড়বে। তখন দেখা দেবে নানা সমস্যা। তাছাড়া শহরের সামর্থ্যের তুলনায় মানুষের সংখ্যা বেশি হলে তা হবে খোঁয়াড়ের মতো। অস্বাস্থ্যকর অসুবিধাজনক। শহরের কোনো নর্দমাই বাইরে হবে না। প্রতিটি নর্দমা হবে মাটির নিচে। সেখান দিয়ে শহরের সব আবর্জনা শহরের বাইরে নদীতে গিয়ে পড়বে।

লিওনার্দোর এই আদর্শ শহরের পরিকল্পনা সর্বযুগে সর্বকালেই প্রযোজ্য। কিন্তু ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও লুডোভিকো লিওনার্দোর এই পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দিতে পারেননি।এরপর লিওনার্দো তৈরি করলেন নগরের ক্যাথিড্রালের এক সম্পূর্ণ নকশা। এসব কাজের অবসরে তিনি চর্চা করতেন জ্যামিতিক, জ্যোতির্বিদ্যা, অঙ্ক এবং এসব ক্ষেত্রে বহু মৌলিক চিন্তার প্রকাশ ঘটেছিল। এসব বৈজ্ঞানিক কাজকর্মের মধ্যেই তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন লুডোভিকোর স্বার্থগত পিতার এক মূর্তি স্থাপন করার। সমস্ত পরিকল্পনা সমাপ্ত করার পর তিনি শুরু করলেন সেই অভূতপূর্ব বিশাল মূর্তি। উচ্চতায় ২৬ ফুট। একটি ঘোড়ার ওপর বসে আছেন স্বর্গত রাজা। মূর্তিটি তৈরি করতে সময় লেগেছিল আট বছর। এই সময় তিনি ম্যাডোনা নামে একটি ছবিও আঁকেন। এবার তাকে নতুন একটা কাজের ভার দিলেন লুডোভিকো। যিশুর জীবনের কোনো বিষয় নিয়ে ছবি আঁকতে হবে।

শুরু হলো লিওনার্দোর ভাবনা। কী ছবি আঁকবেন? দীর্ঘ ভাবনার পর স্থির করলেন যিশুর শেষ ভোজের ছবি আঁকবেন। চিত্রশিল্পের জগতে লাস্ট সাপার সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ছবি। 'যিশু তার বারোজন শিষ্যকে নিয়ে শেষ ভোজে বসেছেন। তার দুপাশে ছয়জন ছয়জন করে শিষ্য। সামনে প্রশস্ত টেবিল। পেছনে জানালা দিয়ে মৃদু আলো এসে পড়েছে। যিশু বলেছেন তোমাদের মধ্যে কেউ একজন বিশ্বাসঘাতকতা করে আমাকে ধরে দেবে। শিষ্যরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। তারা সকলে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে তাদের মধ্যে কে বিশ্বাসঘাতকতা করবে'।

ছবিটি সান্তামারিয়া কনভেন্টের এক দেয়ালে আঁকা হয়েছিল। দি লাস্ট সাপার লিওনার্দোর এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। সমালোচকদের মতে, এখানে লিওনার্দোর মানসিকতা, তার ভাবনা কল্পনার সাথে মিলিত হয়েছে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। লাস্ট সাপার শুধু যে একটি সর্বশ্রেষ্ঠ চিত্র তাই নয়, মানুষের শিল্প প্রতিভা যে কোনো চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাতে পারে এ তারই প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

প্রথমে তিনি এঁকেছিলেন যিশুর বারোজন শিষ্যর মুখ। এই শিষ্যদের মুখে ফুটে উঠেছিল বিচিত্র অনুভূতি। কারও মুখে বিস্ময়, কারও মুখ ভয়, কারও বেদনা সন্দেহ। এক আশ্চর্য সুষমায় প্রতিটি মুখ জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। পরিশেষে তিনি আঁকলেন যিশুর মুখ। শোনা যায় কেমন হবে যিশুর মুখ, দীর্ঘ এক বছর তা স্থির করতে পারেননি। অবশেষে আঁকলেন যিশুর মুখ। এ মুখে ভয় নেই, ঘৃণা নেই, উদ্বেগ নেই। তিনি তো জানতেন তাকে ক্রুশবিদ্ধ হতে হবে। তার কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় এবার তাকে মর্ত্যজগৎ ত্যাগ করতে হবে। ঈশ্বরের ইচ্ছাকে তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। অনুভূতিহীন এক স্বর্গীয় ভাব ফুটে উঠেছে তার মুখে।

লাস্ট সাপার ছাড়াও আরও দুটি তৈলচিত্র এঁকেছিলেন লিওনার্দো। ভার্জিন অব দ্য রকস ও মেসিলিয়া। ১৪৯৯ খ্রিষ্টাব্দে ফরাসি সম্রাট মিলান আক্রমণ করলেন। তিনি মিলান ত্যাগ করে পালিয়ে এলেন ভেনিসে। ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দে মিলান সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়ে ফারসি

অধিকারে চলে গেল। লিওনার্দো আশা করেছিলেন যুদ্ধ মিটে গেলে আবার মিলানে ফিরে যাবেন। কিন্তু যখন সেই আশা পূর্ণ হলো না তিনি ভেনিস ত্যাগ করে রওনা হলেন মাতৃভূমি ফ্লোরেন্সের দিকে। এই সময় সিজার বর্জিয়ার অনুরোধে মধ্য ইতালির বিসতৃত অঞ্চল পরিদর্শন করে ছয়টি ম্যাপ তৈরি করেন। সেই ম্যাপগুলো আজও উইন্ডসর লাইব্রেরিতে রক্ষিত আছে। সেগুলো দেখলে অনুমান করা যায় কি নির্ভুল ছিল তার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং মানচিত্র অঙ্কন করার সহজাত দক্ষতা। ইতিপূর্বে তিনি একটি ছবি এঁকেছিলেন- ভার্জিন অব দ্য রকস। ঝুলে পড়া এক পর্বত। তার মধ্যে ফুটে উঠেছে চিরন্তন মানব আত্মার এক রূপ।

এই সময় লিওনার্দো আঁকলেন তার জগৎ বিখ্যাত মোনালিসা। এই ছবিটি আঁকতে তার তিন বছর সময় লেগেছিল। কে এই মোনালিসা এ বিষয়ে ভিন্নমত আছে। কয়েকজনের অভিমত মোনালিসার প্রকৃত নাম ছিল লিজা। তিনি ছিলেন ফ্লোরেন্সের এক অভিজাত ব্যক্তির স্ত্রী। ভিন্ন মত অনুসারে মোনালিসা ছিলেন জিয়োকোন্ত নামে এক ধনী বৃদ্ধের তৃতীয় পত্নী। নাম মাদোনা এলিজাবেথ। দিনের পর দিন অসংখ্য ভঙ্গিতে মুখের ছবি এঁকেছেন। কিন্তু কোনো ছবিই তার মনকে ভরিয়ে তুলতে পারেনি। একদিন লিওনার্দোর চোখে পড়ল এলিজাবেথের ঠোঁটের কোনায় ফুটে উঠেছে বিচিত্র এক হাসি। চমকে উঠলেন লিওনার্দো। এই হাসির জন্যই যেন তিনি তিন বছর অপেক্ষা করেছিলেন। মুহূর্তে তুলির টানে ফুটিয়ে তুললেন সেই সহাস্যমণ্ডিত কালজয়ী হাসি। চিত্রশিল্পী হিসেবে লিওনার্দোর খ্যাতি জগৎ বিখ্যাত হলেও তার মৃত্যুর পর পাওয়া গিয়েছিল প্রায় পাঁচ হাজার পাতার হাতের লেখা পাণ্ডুলিপি। এই পাণ্ডুলিপিতে তিনি সমস্ত জীবন ধরে যেসব পর্যবেক্ষণ করেছিলেন পরীক্ষা করেছিলেন, তারই বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। এই পাণ্ডুলিপি লেখা হয়েছিল ইতালিয়ান ভাষায় এবং সমস্ত পাণ্ডুলিপিটাই লেখা হয়েছিল উল্টো করে। ফলে সোজাসুজি পড়া যেত না। পড়তে হতো আয়নার মাধ্যমে। প্রতিটি লেখার সঙ্গে থাকত অসংখ্য ছবি।

তার এই পাণ্ডুলিপিতে অসংখ্য বিষয় নিয়ে লেখা হয়েছে। চীন উপকথা, মধ্যযুগীয় দর্শন, সমুদ্রস্রোতের কারণ, বাতাসের গতি, তার চাপ, পৃথিবীর ওজন। নিশাচর পাখির গতিপ্রকৃতি। পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব। উড়ন্ত যান। সাঁতার কাটার যন্ত্র। আলোর প্রকৃতি, যুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্রের নকশা। সুগন্ধ সেন্ট তৈরির ফর্মুলা। বিভিন্ন পাখি জন্তু-জানোয়ারের আচার-আচরণ, বিভিন্ন গাণিতিক সূত্র।

তার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা এত গভীর ছিল যে গোপনে বেশকিছু মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করে দেখেছিলেন দেহের গঠন। তার এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বেশ কিছু শারীরতত্ত্বের ছবি এঁকেছিলেন। সেই ছবি এত নির্ভুল ছিল, পরবর্তীকালে চিকিৎসকরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন। আধুনিক উড়োজাহাজের তিনিই প্রথম নকশা আঁকেন। তার পাণ্ডুলিপির এক জায়গায় লিখেছেন একদিন মানুষ আকাশে উড়বেই।

লিওনার্দোর মৃত্যুর প্রায় আড়াইশ বছর পর একজন পন্ডিত তার পাণ্ডুলিপির সম্পূর্ণ পাঠ উদ্ধার করে চৌদ্দটি খণ্ডে প্রকাশ করে। দীর্ঘ ছয় বছর লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি ফ্লোরেন্সে কাটিয়ে দিলেন কিন্তু শেষ দিকে তার আর ফ্লোরেন্স ভালো লাগছিল না। তিনি ফিরে গেলেন মিলানে। মাঝে মাঝে ফ্লোরেন্সে যেতেন। ১৫১৬ সালে লিওনার্দো ফারসি সম্রাটের আমন্ত্রণে প্যারিসে গেলেন। সম্রাট লিওনার্দোকে খুবই সম্মান করতেন। ক্রমশই স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ছিল। ডান হাত অকর্মণ্য হয়ে গিয়েছিল। বাঁ হাতেই তিনি ছবি আঁকতেন। এই সময় তিনি ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। অবশেষে ৬৭ বছর বয়সে ২ মে ১৫১৯ সালে চিরদিনের জন্য পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি-ইতালীয় রেনেসাঁসের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ।

TANBIR 01738359555

সক্রেটিস

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ১০০ মনীষীর জীবনী থেকে

(খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩৯-৪৬৯)

দিন শেষ হয়ে গিয়েছিল। দুজন মানুষ তার চেয়েও দ্রুত এগিয়ে চলছিলেন। ওই আঁধার নামার আগেই তাদের পৌঁছাতে হবে ডেলফিতে। একজনের নাম চেরেফোন (Chaerephon) মধ্যবয়সী গ্রিক।

দুজনে এসে থামলেন ডেলফির বিরাট মন্দির প্রাঙ্গণে। সিঁড়ি বেয়ে ভেতরে প্রবেশ করতেই মন্দিরের পূজারি এগিয়ে এলো। চেরেফোন তার দিকে চেয়ে বললেন, আমরা দেবতার কাছে একটি বিষয় জানার জন্য এসেছি। পূজারি বলল, আপনারা প্রভু অ্যাপলের মূর্তির সামনে গিয়ে নিজেদের পরিচয় দিন আর বলুন আপনারা কী জানতে চান?

কুৎসিত চেহারার মানুষটি প্রথমে এগিয়ে এসে বললেন, আমি সক্রেটিস, প্রভু, আমি কিছুই জানি না। এবার চেরেফোন নিজের পরিচয় দিয়ে বললেন, হে সর্বশক্তিমান দেবতা, আপনি বলুন গ্রিসের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী কে?

চেরেফোনের কথা শেষ হতেই চারদিক কাঁপিয়ে আকাশ থেকে এক দৈববাণী ভেসে এলো।

যে নিজেকে জানেন সেই সক্রেটিসের জন্ম (খ্রিষ্টপূর্ব ৪৬৯/৪৬৩) পিতা সফরেনিকাশ (Sopphroniscus) ছিলেন স্থপতি। পাথরের নানা মূর্তি গড়তেন মা ফেনআরেট (Sopphroniscus)। ছিলেন ধাত্রী।

পিতা-মাতা দুজনে দুই পেশায় নিযুক্ত থাকলেও সংসারে অভাব লেগেই থাকত। তাই ছেলেবেলায় পড়াশোনার পরিবর্তে পাথর কাটার কাজ নিতে হলো। কিন্তু অদম্য জ্ঞানসপৃহা সক্রেটিসের। যখন যেখানে যেটুকু জানার সুযোগ পান সেটুকু জ্ঞান সঞ্চয় করেন। এমনি করেই বেশ কয়েক বছর কেটে গেল।

একদিন ঘটনাচক্রে পরিচয় হলো এক ধনী ব্যক্তির সঙ্গে। তিনি সক্রেটিসের ভদ্র ও মধুর আচরণে, বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর পড়াশোনার দায়িত্ব নিলেন।

পাথরের কাজ ছেড়ে সক্রেটিস ভর্তি হলেন এনাক্সগোরাস (Anaxagoras) নামের এক গুরুর কাছে। কিছুদিন পর কোনো কারণে এনাক্সগোরাস আদালতে অভিযুক্ত হলে সক্রেটিস আরখ এখলাসের শিষ্য হলেন।

এই সময় গ্রিস দেশ ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ফলে নিজেদের মধ্যে মারামারি, যুদ্ধবিগ্রহ, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব লেগেই থাকত। দেশের প্রতিটি তরুণ, যুবক, সক্ষম পুরুষদের যুদ্ধে যেতে হতো।

সক্রেটিসকেও এথেন্সের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে অ্যামপিপোলিস অভিযানে যেতে হলো। এই যুদ্ধের পর তার মন ক্রমশই যুদ্ধের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠল।

চিরদিনের মতো সৈনিকবৃত্তি পরিত্যাগ করে ফিরে এলেন এথেন্সে। এথেন্স তখন জ্ঞান-গরিমা, ব্যবসা-বাণিজ্য, শৌর্য, বীর্যে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশ। শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির এক স্বর্ণযুগ।

এই পরিবেশে নিজেকে জ্ঞানের জগৎ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলেন না সক্রেটিস। তিনি ঠিক করলেন জ্ঞানের চর্চায়, বিশ্ব প্রকৃতি জানার সাধনায় নিজেকে উৎসর্গ করবেন।

Email: tanbir_cox@yahoo.com web: http://tanbir.99k.org

প্রতিদিন ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে সামান্য প্রাতরাশ সেরে বেরিয়ে পড়তেন। খালি পা, গায়ে একটা মোটা কাপড় জড়ানো থাকত। কোনোদিন গিয়ে বসতেন নগরের কোনো দোকানে, মন্দিরের চাতালে কিংবা বন্ধুর বাড়িতে। নগরের যেখানেই লোকজনের ভিড় সেখানেই খুঁজে পাওয়া যেত সক্রেটিসকে। প্রাণ খুলে লোকজনের সঙ্গে গল্প করছেন। আড্ডা দিচ্ছেন, মাঝে মাঝে প্রশ্ন করছেন, নিজে এমন ভাব দেখাতেন যেন কিছুই জানেন না, বোঝেন না। লোকের কাছ থেকে জানার জন্য প্রশ্ন করছেন।

আসলে প্রশ্ন করা, তর্ক করা ছিল সে যুগের এক শ্রেণীর লোকদের ব্যবসা। এদের বলা হতো সোফিস্ট। এরা পয়সা নিয়ে বড় বড় কথা বলত।

যারা নিজেদের পাণ্ডিত্যের অহংকার করত, বীরত্বের বড়াই করত, তিনি সরাসরি জিজ্ঞেস করতেন, বীরত্ব বলতে তারা কী বোঝে? পাণ্ডিত্যের স্বরূপ কী? তারা যখন কোনো কিছু উত্তর দিত, তিনি আবার প্রশ্ন করতেন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন সাজিয়ে বুঝিয়ে দিতেন তাদের ধারণা কত ভ্রান্ত। মিথ্যা অহমিকায় কতখানি ভরপুর হয়ে আছে তারা। নিজেদের স্বরূপ এভাবে উদঘাটিত হয়ে পড়ায় সক্রেটিসের ওপর তারা সকলে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। কিন্তু সক্রেটিস তাতে সামান্যতম বিচলিত হতেন না। নিজের আদর্শ, সত্যের প্রতি তার ছিল অবিচল আস্থা। সেই সাথে ছিল অর্থ সম্পদের প্রতি চরম উদাসীনতা।

একবার তার বন্ধু অ্যালসিবিয়াদেশ তাকে বাসস্থান তৈরি করার জন্য বিরাট একখণ্ড জমি দিতে চাইলেন। সক্রেটিস বন্ধুর দান ফিরিয়ে দিয়ে সকৌতুকে বললেন, আমার প্রয়োজন একটি জুতার আর তুমি দিচ্ছ একটি বিরাট চামড়া এ নিয়ে আমি কী করব জানি না।

পার্থিব সম্পদের প্রতি নিসপৃহতা তার দার্শনিক জীবনে যতখানি শান্তি নিয়ে এসেছিল, তার সাংসারিক জীবনে ততখানি অশান্তি নিয়ে এসেছিল। কিন্তু তার প্রতিও তিনি ছিলেন সমান নিসপৃহ।

তার স্ত্রী জ্যানথিপি (Xanthiphe) ছিলেন ভয়ংকর রাগী মহিলা। সাংসারিক ব্যাপারে সক্রেটিসের উদাসীনতা তিনি মেনে নিতে পারতেন না। একদিন সক্রেটস গভীর একাগ্রতার সাথে একখানি বই পড়ছিলেন। প্রচণ্ড বিরক্তিতে জ্যানথিপি গালিগালাজ শুরু করে দিলেন। কিছুক্ষণ সক্রেটিস স্ত্রীর বাক্যবাণে কর্ণপাত করলেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর ধৈর্য রক্ষা করতে না পেরে বাইরে গিয়ে আবার বইটি পড়তে আরম্ভ করলেন। জ্যানথিপি আর সহ্য করতে না পেরে এক বালতি পানি এনে তার মাথায় ঢেলে দিলেন। সক্রেটিস মৃদু হেসে বললেন, আমি আগেই জানতাম যখন এত মেঘগর্জন হচ্ছে তখন শেষ পর্যন্ত একপশলা বৃষ্টি হবেই।

জ্যানথিপি ছাড়াও সক্রেটিসের আরো একজন স্ত্রী ছিলেন, তার নাম মায়ার্ত (Myrto)।

দুই স্ত্রীর গর্ভে তার তিনটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেছিল। দারিদ্র্যের মধ্যে হলেও তিনি তাদের ভরণ পোষণ শিক্ষার ব্যাপারে কোনো উদাসীনতা দেখাননি।

তিনি বিশ্বাস করতেন শিক্ষাই মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। শিক্ষার মধ্যেই মানুষের অন্তরের জ্ঞানের পূর্ণ জ্যোতি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। জ্ঞানের মধ্যে দিয়েই মানুষ একমাত্র সত্যকে চিনতে পারে। যখন তার কাছে সত্যের স্বরূপ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সে আর কোনো পাপ করে না। অজ্ঞানতা থেকেই সমস্ত পাপের জন্ম। তিনি চাইতেন মানুষের মনের সেই অজ্ঞানতাকে দূর করে তার মধ্য বিচার বুদ্ধি বোধকে জাগ্রত করতে। যাতে তারা সঠিকভাবে নিজেদের কর্মকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে।

তার লক্ষ্য ছিল আলোচনা জিজ্ঞাসা প্রশ্নের মধ্য দিয়ে সেই সত্যকে উপলব্ধি করতে মানুষকে সাহায্য করা।

কথার মধ্য দিয়ে তর্ক বিচারের পদ্ধতিকে দার্শনিকরা আস্তি নাস্তিমূলক পদ্ধতি (Dialectic Methood) নাম দিয়েছেন, সক্রেটিস এই পদ্ধতির সূত্রপাত করেছিলেন। পরবর্তীকালের তার শিষ্য প্লেটো, প্লেটোর শিষ্য অ্যারিস্টটল সেই ধারাকে পরিপূর্ণরূপে বিকশিত করেছিলেন ন্যায় শাস্ত্রে।

খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের শেষ ভাগ থেকে পঞ্চম শতাব্দীর শেষার্ধ পর্যন্ত গ্রিক সভ্যতার স্বর্ণযুগ। এই যুগেই সক্রেটিসের জন্ম। কিন্তু তার যৌবনকাল থেকে এই সভ্যতার অবক্ষয় শুরু হলো। পরসপরের সঙ্গে দীর্ঘ যুদ্ধবিগ্রহের ফলে প্রত্যেকেরই প্রভাব-প্রতিপত্তি কমতে আরম্ভ করল। গ্রিসের সবচেয়ে সমৃদ্ধ রাষ্ট্র এথেন্সও তার প্রভাব থেকে বাদ পড়ল না। শুধু অর্থনীতি নয়, সমাজ রাজনীতিতেও নেমে এলো বিপর্যয়। তর্কের মধ্যে দিয়ে আলোচনার পথ ধরে মানুষের মধ্যে চিন্তার উন্মেষ ঘটানো, সত্যের পথে মানুষকে চালিত করা। সক্রেটিসের আদর্শকে দেশের বেশ কিছু মানুষ সুনজরে দেখেনি। তারা সক্রেটিসের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা করল। তাছাড়া যারা ঐশ্বর্য, বীরত্ব শিক্ষার অহংকারে নিজেদের শ্রেষ্ঠ বলে মনে করত, সক্রেটিসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাদের এই অহংকারের খোলসটা খসে পড়ত। এভাবে নিজেদের স্বরূপ উদঘাটিত হয়ে পড়ায় অভিজাত শ্রেণীর মানুষরা সক্রেটিসের ঘোর বিরোধী হয়ে উঠল। তাদের চক্রান্তে দেশের নাগরিক আদালতে সক্রেটিসের ঘোর বিরোধী অভিযোগ আনা হলো (৩৯৯ খ্রিষ্টপূর্ব)।

তার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ ছিল তিনি এথেন্সের প্রচলিত দেবতাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করে নতুন দেবতার প্রবর্তন করতে চাইছেন। দ্বিতীয়ত তিনি দেশের যুবসমাজকে ভ্রান্ত পথে চালিত করেছেন।

তার বিরুদ্ধে অভিযোগের আরো দুটি কারণ ছিল সপার্টার সঙ্গে ২৭ বছরের যুদ্ধে এথেন্সের পরাজয়ের ফলে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে বিরাট আঘাত এলো। অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দিল। সেকালের ধর্মবিশ্বাসী মানুষরা মনে করল নিশ্চয়ই দেবতাদের অভিশাপেই এই পরাজয় আর এর জন্য দায়ী সক্রেটিসের ঈশ্বরবিদ্বেষী শিক্ষা।

সক্রেটিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ নিয়ে এলো মেলেতুল, লাইকন, আনাতুস নামে এথেন্সের তিনজন সমভ্রান্ত নাগরিক। এই অভিযোগের বিচার করার জন্য আলোচোনের সভাপতিত্বে ৫০১ জনের বিচারকমণ্ডলী গঠিত হলো। এই বিচারকমণ্ডলীর সামনে সক্রেটিস এক দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তার বিরোধীপক্ষ কী বলেছিল তা জানা যায়নি। তবে সক্রেটিসের জবানবন্দি লিখে রেখে গিয়েছিলেন প্লেটো। এক আশ্চর্য সুন্দর বর্ণনায়, বক্তব্যের গভীরতায় এই রচনা বিশ্ব সাহিত্যের এক শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

...হে এথেন্সের অধিবাসীগণ, আমার অভিযোগকারীদের বক্তৃতা শুনে আপনাদের কেমন লেগেছে জানি না, তবে আমি তাদের বক্তৃতার চমকে আত্মবিস্মৃত হয়েছিলাম, যদিও তাদের বক্তৃতায় সত্য ভাষণের চিহ্নমাত্র নেই। এর উত্তরে আমার বক্তব্য পেশ করছি। আমি অভিযোগকারীদের মতো মার্জিত ভাষার ব্যবহার জানি না। আমাকে শুধু ন্যায়বিচারের স্বার্থে সত্য প্রকাশ করতে দেয়া হোক।

কেন আমি আমার দেশবাসীর বিরাগভাজন হলাম? অনেক দিন আগে ডেলফির মন্দিরে দৈববাণী শুনলাম তখনই আমার মনে হলো এর অর্থ কী? আমি তো জ্ঞানী নই তবে দেবী কেন আমাকে দেবীর কাছে নিয়ে গিয়ে বলল এই দেখ আমার চেয়ে জ্ঞানী মানুষ। আমি জ্ঞানী মানুষ খুঁজতে আরম্ভ করলাম। ঠিক একই জিনিস লক্ষ করলাম। সেখান থেকে গেলাম কবিদের কাছে। তাদের সাথে কথা বলে বুঝলাম তারা প্রকৃতই অজ্ঞ। তারা ঈশ্বরদত্ত শক্তি ও প্রেরণা থেকেই সবকিছু সৃষ্টি করেন, জ্ঞান থেকে নয়।

শেষ পর্যন্ত গেলাম শিল্পী, কারিগরদের কাছে। তারা এমন অনেক বিষয় জানেন যা আমি জানি না। কিন্তু তারাও কবিদের মতো সব ব্যাপারেই নিজেদের চরম জ্ঞানী বলে মনে করত আর এই ভ্রান্তিই তাদের প্রকৃত জ্ঞানকে ঢেকে রেখেছিল।

এই অনুসন্ধানের জন্য আমার অনেক শত্রু সৃষ্টি হলো। লোকে আমার নামে অপবাদ দিল, আমিই নাকি একমাত্র জ্ঞানী কিন্তু ততদিনে আমি দৈববাণীর অর্থ উপলব্ধি করতে পেরেছি। মানুষের জ্ঞান কত অকিঞ্চিৎকর। দেবতা আমার নামটা দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্যবহার করে

বলতে চেয়েছিলেন তোমাদের মধ্যে সেই সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী যে সক্রেটিসের মতো জানে, যে সত্য সত্যই জানে আর জ্ঞানের কোনো মূল্য নেই।

আমি নিশ্চিত যে আমি অনেকের অপ্রিয়তা এবং শত্রুতা অর্জন করেছি এবং আমার চরম দণ্ড হলে এই শত্রুতার জন্যই হবে, মেলেতুস বা আনিতুসের জন্য নয়। দণ্ড হলে তা হবে জনতার ঈর্ষা ও সন্দেহের জন্য যা আমার আগে অনেক সৎকারের নিধনের কারণ হয়েছে এবং সম্ভবত আরো অনেকের নিধনের কারণ হবে। আমিই যে তাদের শেষ বলি তা মনে করার কোনো কারণ নেই...অতএব হে এথেন্সের নাগরিকগণ, আমি বলি তোমরা হয় আনিতুসের কথা শোন অথবা অগ্রাহ্য কর। হয় আমাকে মুক্তি দাও নয়তো দিও না, কিন্তু নিশ্চিত থাকতে পার আমি আমার জীবনের ধারা বদলাব না।

...আমাকে ঈশ্বর এই রাষ্ট্র আক্রমণ করতে পাঠিয়েছেন। রাষ্ট্র হলো একটি মহৎ সুন্দর ঘোড়া। তার বৃহৎ আয়তনের জন্য সে শ্লথগতি এবং তার গতি দ্রুততর করতে, তাকে জাগিয়ে তোলার জন্য মৌমাছির প্রয়োজন ছিল। আমি মনে করি যে আমি ঈশ্বর প্রেরিত সেই মৌমাছি। আমি সর্বক্ষণ তোমাদের দেহে হুল ফুটিয়ে তোমাদের মধ্যে সুস্থ ভাবনা জাগিয়ে তুলি, যুক্তির দ্বারা উদ্বুদ্ধ করি এবং প্রত্যেককে তিরস্কারের দ্বারা তৎপর করে রাখি।

...বন্ধুগণ সম্ভব অসম্ভবের কথা বাদ দিয়ে বলছি মুক্তিলাভের জন্য বা দণ্ড এড়ানোর জন্য বিচারকদের অনুনয় করা অসঙ্গত। যুক্তি পেশ করে তাদের মনে প্রত্যয় জন্মানোই আমাদের কর্তব্য, বিচারকের কর্তব্য হচ্ছে ন্যায়বিচার করা। বিচারের নামে বন্ধু তোষণ করা নয়।

...আমি দেবতাকে বিশ্বাস করি, আমার অভিযোগকারীরা যতখানি বিশ্বাস করে তার চেয়েও অনেক বেশি বিশ্বাস করি। এতক্ষণ আমি ঈশ্বর এবং তোমাদের সামনে আমার বক্তব্য রাখলাম। এবার তোমাদের এবং আমার পক্ষে যা সর্বোত্তম সেই বিচার হোক।

কিন্তু বিচারে ২৮১-২২০ ভোটে সক্রেটিসকে দোষী সাব্যস্ত করা হলো। সেই যুগে এথেন্সে কোনো অভিযুক্তকে দোষী ঘোষণা করা হলে তাকে দুটি শাস্তির মধ্যে যে কোনো একটিকে বেছে নেয়ার সুযোগ দেয়া হতো।

কিন্তু সক্রেটিস বিশ্বাস করতেন তিনি নির্দোষ, তাই রায় ঘোষিত হওয়ার পর তিনি উত্তর দিলেন, হে এথেন্সের অধিবাসীগণ, আমার পক্ষ থেকে কি পাল্টা দণ্ড প্রস্তাব করব? আমার যা ন্যায়ত প্রাপ্য তাই নয় কি? আমি তোমাদের প্রত্যেকের কাছে ব্যক্তিগতভাবে গিয়েছি, সে শুধু তোমাদের কল্যাণের জন্য। এভাবে আমি তোমাদের উপকার করতে চেয়েছি। উপকারীকে সরকারি ব্যয় ভরণ-পোষণের ভার গ্রহণ করা হোক এই আমার শেষ ইচ্ছা।

সক্রেটিসের এই বক্তব্যে জুরিরা আরো ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। তাদের ধারণা হলো সক্রেটিস তাদের ব্যঙ্গ করছেন। আরো অনেকে তার বিরুদ্ধে চলে গেল এবং বিচারে তার মৃত্যুদণ্ড দেয়া হলো।

সেই ভয়ঙ্কর রায় শুনে এতটুকু বিচলিত হলেন না সক্রেটিস। স্থির শান্তভাবে বললেন, এখন সময় হয়েছে আমাদের সকলকে চলে যাওয়ার, তবে আমি যাব মৃত্যুর দিকে, তোমরা যাবে জীবনের দিকে। জীবন কিংবা মৃত্যু-একমাত্র ঈশ্বরই বলতে পারেন এর মাঝে শ্রেষ্ঠ কে?

সক্রেটিসের বন্ধুদের মধ্যে ক্রিটো ছিলেন সবচেয়ে ধনী। তিনি কারারক্ষীদের ঘুষ দিয়ে সক্রেটিসকে অন্য দেশে পালিয়ে যেতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু সক্রেটিস বিশ্বাস করতেন দেশের প্রত্যেক নাগরিকেরই দেশের আইনশৃঙ্খলা মেনে চলা কর্তব্য। বিচারালয়ের আদেশ উপেক্ষা করে অন্য দেশে পালিয়ে যাওয়ার অর্থ আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করা। তাছাড়া এতে সকলের মনে এই ধারণা হবে যে সক্রেটিস সত্যি সত্যিই অপরাধী। তাকে দোষী সাব্যস্ত করে বিচারকরা ঠিক কাজই করেছেন।

মৃত্যুর দিন সকল শিষ্য একে একে উপস্থিত হলেন কারাগারে।

তিনি গোসল করে ফিরে এলেন। সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়েছে। মুহূর্তে মৃত্যুদূতের মতো দ্বারে এসে দাঁড়াল জেলের কর্মচারী। গভীর বেদনায় কাঁদতে কাঁদতে ঘোষণা করল সক্রেটিসের বিষপানের সময় হয়েছে।

ক্রিটো বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা রাজকর্মচারীর দিকে ইঙ্গিত করতেই জল্লাদ কক্ষে প্রবেশ করল, হাতে তার বিষের পাত্র। সক্রেটিস হাসিমুখে সেই পাত্র নিজের হাতে তুলে নিলেন। অকল্পিতভাবে শেষবারের মতো ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন তারপরই সমস্ত বিষ পান করলেন।

তারপর জল্লাদের নির্দেশে ঘরের মধ্যে হাঁটতে আরম্ভ করলেন। ধীরে ধীরে বিষ তার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। পা দুটো ভারী হয়ে এলো। চলৎশক্তিহীন হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। কাপড়ে মুখ ঢেকে দিলেন। কয়েক মুহূর্ত সব শান্ত। মৃত্যুর সব শান্ত। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সক্রেটিস যাত্রা করলেন অমৃতলোকে।

তার মৃত্যুর পরেই এথেন্সের মানুষ ক্ষোভে দুঃখে ফেটে পড়ল। চারদিকে ধিক্কার ধ্বনি উঠল। বিচারকদের দল সর্বত্র একঘরে হয়ে পড়ল। অনেকে অনুশোচনায় আত্মহত্যা করলেন। অভিযোগকারীদের মধ্যে মেনেতুসকে পিটিয়ে মারা হলো, অন্যদেশ থেকে বিতাড়িত করা হলো। দেশের লোকেরা তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বিরাট মূর্তি প্রতিষ্ঠা করল।

প্রকৃতপক্ষে সক্রেটিসই পৃথিবীর প্রথম দার্শনিক, চিন্তাবিদ যাকে তার চিন্তা দর্শনের জন্য মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। কিন্তু মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার নশ্বর দেহের শেষ হলেও চিন্তার শেষ হয়নি। তার শিষ্য প্লেটো, প্লেটোর শিষ্য অ্যারিস্টটলের মধ্য দিয়ে সেই চিন্তার এক নতুন জগৎ সৃষ্টি হলো, যা মানুষকে উত্তেজিত করেছে আজকের পৃথিবীতে।

চার্লস ডারউইন

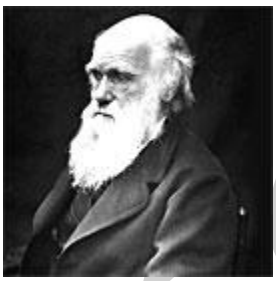

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ১০০ মনীষীর জীবনী থেকে

ডারউইনের জন্ম হয় ১৮০৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি ইংল্যান্ডের এক সমভ্রান্ত পরিবারে। পিতা ছিলেন নামকরা চিকিৎসক।

মাত্র আট বছর বয়সে মাকে হারালেন ডারউইন। সেই সময় থেকে পিতা আর বড় বোনদের স্নেহ ছায়ায় বড় হয়ে উঠতে লাগলেন। নয় বছর বয়সে স্কুলে ভর্তি হলেন। চিরাচরিত পাঠ্যসূচির মধ্যে কোনো আনন্দই পেতেন না। তিনি লিখেছেন, বাড়িতে তার ভাই একটি ছোট ল্যাবরেটরি গড়ে তুলেছিলেন। সেখানে তিনি রসায়নের নানা মজার খেলা খেলতেন।

ষোল বছর বয়সে চার্লসকে ডাক্তারি পড়ার জন্য এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেয়া হলো। যার মন প্রকৃতির রূপ রস গন্ধে পূর্ণ হয়ে আছে, মরা দেহের হাড় অস্থি মজ্জা তাঁকে কেমন করে আকর্ষণ করবে! ওষুধের নাম মনে রাখতে পারতেন না। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিবরণ পড়তে বিরক্তিবোধ করতেন। আর অপারেশনের কথা শুনলেই আঁতকে উঠতেন।

চার্লসের পিতা বুঝতে পারলেন ছেলের পক্ষে ডাক্তার হওয়া সম্ভব নয়। তাকে কেমব্রিজের ক্রাইস্ট কলেজে ভর্তি করা হলো। উদ্দেশ্য ধর্মযাজক করা।

সেই সময় কেমব্রিজের উদ্ভিদবিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন হেনসলো (Henslow)। হেনসলোর সাথে পরিচয় হওয়ার পর থেকেই তার অনুরাগী হয়ে পড়লেন চার্লস। অল্পদিনের মধ্যেই গুরু-শিষ্যের মধ্যে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে উঠল।

কেমিব্রজ থেকে পাস করে তিনি কিছুদিন ভূবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করতে থাকেন। অপ্রত্যাশিতভাবে চার্লস ডারউইনের জীবনে এক অযাচিত সৌভাগ্যের উদয় হলো। অধ্যাপক হেনসলোর কাছ থেকে একখানি পত্র পেলেন ডারউইন। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে বিগল (H. M. S. Beagle) নামে একটি জাহাজ দক্ষিণ আমেরিকা অভিযানে বের হবে। এই অভিযানের প্রধান হলেন ক্যাপ্টেন ফিজরয়। এই অভিযানের উদ্দেশ্য হলো প্রাকৃতিক পরিবেশ, জীবজন্তু, গাছপালা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা এবং বৈশিষ্ট্যকে পর্যবেক্ষণ করা। এই ধরনের কাজে বিশেষজ্ঞ এবং অনুরাগী ব্যক্তিরাই অভিযানের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে।

এই অভাবনীয় সৌভাগ্যের সুযোগকে কিছুতেই হাতছাড়া করতে চাইলেন না ডারউইন। ১৮৩১ সালের ২৭ ডিসেম্বর 'বিগল' দক্ষিণ আমেরিকা অভিমুখে যাত্রা শুরু করল।

ক্যাপ্টেন ফিজরয়ের নেতৃত্বে দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে জাহাজ ভেসে চলল পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল ছাড়াও গালাপগোস দ্বীপপুঞ্জ, তাহিতি, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, মালদ্বীপ, সেন্ট হেলেনা দ্বীপে জাহাজ ঘুরে বেড়াল। এই সময়ের মধ্যে ডারউইন ৫৩৫ দিন কাটিয়েছিলেন সাগরে আর ১২০০ দিন ছিলেন মাটিতে।

ডারউইন যা কিছু প্রত্যক্ষ করতেন তার নমুনার সাথে সুনির্দিষ্ট বিবরণ, স্থান, সংগ্রহের তারিখ লিখে রাখতেন। কোনো তত্ত্বের দিকে তার নজর ছিল না। বাস্তব তথ্যের প্রতি ছিল তার আকর্ষণ।

২৪ জুলাই ১৮৩৪ সাল। ডারউইন লিখেছেন 'ইতিমধ্যে ৪৮০০ পাতার বিবরণ লিখেছি, এর মধ্যে অর্ধেক ভূবিদ্যা, বাকি বিভিন্ন প্রজাতির জীবজন্তুর বিবরণ।'

'বিগল' জাহাজে চড়ে দেশভ্রমণের সময় মাঝে মাঝেই অসুস্থ হয়ে পড়তেন। দীর্ঘ পাঁচ বছর পর যখন ১৮৩৬ সালে ইংল্যান্ডে প্রত্যাবর্তন করলেন ডারউইন তখন তার শরীর স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছে। কিন্তু অদম্য মনোবল, বাড়ির সকলের সেবায় অল্প দিনেই সুস্থ হয়ে উঠলেন।

এই সময় তিনি তার কাজিন এস্মা ওয়েজউডকে বিবাহ করেন। বিবাহের সূত্রে বেশ কিছু সম্পত্তি লাভ করেন ডারউইন। এস্মার গর্ভে ডারউইনের দশটি সন্তান জন্মায়, শুধু মা হিসেবে নয়, স্ত্রী হিসেবেও এস্মা ছিলেন অসাধারণ।

ডারউইনের পরবর্তী বই এক ধরনের সামুদ্রিক গুগলিদের নিয়ে। এই বইটি লিখতে ডারউইনের সময় লেগেছিল আট বছর। এই সময় তাঁর মনোজগতে এক নতুন চিন্তার জন্ম হচ্ছিল। যদিও সুদীর্ঘ দিন পর্যন্ত তা ছিল অসংলগ্ন বিশৃঙ্খল। কিন্তু নিরলস পরিশ্রম, অধ্যবসায়, বিশ্লেষণ, গবেষণার মধ্য দিয়ে তারই মধ্যে থেকে সৃষ্টি হচ্ছিল এক নতুন মতবাদ-বিবর্তনবাদ।

ডারউইন প্রথমে তাঁর বিবর্তনবাদের প্রাথমিক খসড়া তৈরি করেন। ১৮৪২ সালে এরই বিসতৃতি ঘটে ৩৫ পাতার একটি রচনার মধ্যে। দু-বছর পর অপেক্ষাকৃত বিস্তারিতভাবে প্রস্তুত করলেন বিবর্তনবাদের ওপর ২৩০ পাতার পাণ্ডুলিপি। এরপর শুরু হলো পাণ্ডুলিপি সংশোধনের কাজ। তাতে নতুন তথ্য সংযোজন করা, প্রতিটি তথ্যের বিচার-বিশ্লেষণ করা, তাকে আরো যুক্তিনিষ্ঠ করা হয়। সুদীর্ঘ পনেরো বছর ধরে চলেছিল এই সংশোধন পর্ব।

এবার ডারউইন বই লেখার কাজে হাত দিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি গবেষণার কাজ যতখানি ভালোবাসতেন লেখালেখি করতে ততখানিই বিরক্তিবোধ করতেন।

অবশেষে ২৪ নভেম্বর ১৮৫৯ সালে ডারউইনের বই প্রকাশিত হলো। বইয়ের নাম The origin of species by means of Natural Selection or the preservation of Favoured Races in the struggle for life.(পরবর্তীকালে এই বই শুধু Origin of Species নামে পরিচিত হয়)।

প্রকাশের সাথে সাথে ১২৫০ কপি বই বিক্রি হয়ে গেল। বিবর্তনবাদের নতুন তত্ত্ব বাইবেলের আদম ইভের কাহিনী, পৃথিবীর সৃষ্টির কাহিনীকে বৈজ্ঞানিক তথ্যের বিশ্লেষণে সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণিত করলেন। এই বইতে তিনি লিখেছেন, আমাদের এই পৃথিবীতে প্রতিমুহূর্তে নতুন প্রাণের জন্ম হচ্ছে। জীবনের সংখ্যা ক্রমাগতই বেড়ে চলেছে। কিন্তু খাদ্যের পরিমাণ সীমাবদ্ধ। সেই কারণে নিয়ত জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে চলেছে অস্তিত্ব রক্ষার জন্য বিরামহীন প্রতিযোগিতা। যারা পরিবেশের সাথে নিজেদের সামঞ্জস্য বিধান করতে পেরেছে তারাই নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছে। কিন্তু যারা পারেনি তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। এই ধারাকেই বলা হয়েছে যোগ্যতমের জয় 'Survival of the fittest'।

কিন্তু সময়ের সাথে সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশেরও পরিবর্তন হচ্ছে। সমুদ্রের মধ্যে জন্ম হচ্ছে স্থলভাগের, কত স্থলভাগ হারিয়ে যাচ্ছে সমুদ্রগর্ভে। আবহাওয়ার পরিবর্তন হচ্ছে, নদীর গতিপথ পরিবর্তন হচ্ছে, অরণ্য ধ্বংস হচ্ছে। এই পরিবর্তনের সাথে সাথে জীবিত প্রাণেরও পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়ছে সঠিক নির্বাচন।

ডারউইনের মতবাদ এই পরিবর্তনশীলতা, বংশগতি এবং প্রাকৃতিক নির্বাচনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাকৃতিক নির্বাচনের সাহায্যে প্রাণী পরিবেশের সাথে নিজেকে সামঞ্জস্য বিধান করে। জীবের সুবিধার জন্য এই পরিবর্তন তাদের উত্তরোত্তর উন্নতি ঘটায়, সৃষ্টি করে নতুন প্রজাতির।

The Origin of the species- প্রকাশিত হওয়ার পর ডারউইন তার বিবর্তনবাদ তত্ত্বকে আরো উন্নতভাবে প্রকাশ করার জন্য ১৮৬৮ সালে প্রকাশ করলেন Variation of Animals and Plant under Domestication। ১৮৭১ সালে প্রকাশিত হলো ডারউইনের আর একখানি বিখ্যাত রচনা The Descent of Man.

প্রাণে বিকাশ বৃদ্ধির সাথে সাথে তার অস্তিত্বের সংকট দেখা দিচ্ছে। প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে যোগ্যতমের জয় হচ্ছে। এক প্রজাতি থেকে জন্ম নিচ্ছে আরেক প্রজাতি। প্রাণী প্রতিনিয়ত নিজেকে উন্নত করছে এক স্তর থেকে আরেক স্তরে। ডারউইনের মত অনুসারে মানুষ নিম্নতর জীব থেকে ধাপে ধাপে উন্নত জীবের স্তরে এসে পৌঁছেছে। এই ক্রমবিবর্তনের চিত্রই তিনি এঁকেছেন তার The Descent of Man গ্রন্থে।

ডারউইনের বিবর্তনবাদের প্রসঙ্গে অনেকের ধারণা মানুষের উৎপত্তি বাঁদর থেকে। কিন্তু ডারউইন কখনো এই ধরনের কথা বলেননি। তার অভিমত ছিল মানুষ এবং বাঁদুর উভয়েই কোনো এক প্রাগৈতিহাসিক জীব থেকে বিবর্তিত হয়েছে। বাঁদররা কোনোভাবেই আমাদের পূর্বপুরুষ নয়, তার চেয়ে দূর সম্পর্কের আত্মীয় বলা যেতে পারে।

ডারউইনের মতে, মানুষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব কারণ সমস্ত জীবজগতের মধ্যে সে সকলের চেয়ে বেশি যোগ্যতম। প্রকৃতপক্ষে মানুষ কোনো স্বর্গচ্যুত দেবদূত নয়, সে বর্বরতার স্তর থেকে উন্নত জীব। এগিয়ে চলাই তার লক্ষ্য।

তিনি যখন শেষবারের মতো লন্ডনে এসেছিলেন তখন তার বয়স ৭৩ বছর। এক বন্ধুর বাড়ির দরজার সামনে এসেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বন্ধু বাড়িতে ছিলেন না। বন্ধুর বাড়ির চাকর ছুটে আসতেই ডারউইন বললেন, তুমি ব্যস্ত হয়ো না, আমি একটা গাড়ি ডেকে বাড়ি চলে যেতে পারব।

কাজের লোককে কোনোভাবে বিব্রত না করে ধীরে ধীরে নিজের বাড়িতে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। আর বিছানা থেকে উঠতে পারেননি তিনি। ক্রমশই তার অসুস্থতা বেড়ে চলল। ডারউইন বুঝতে পারছিলেন তার দিন শেষ হয়ে আসছে।

তিন মাস অসুস্থ থাকার পর ১৯ এপ্রিল ১৮৮২ সাল, পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিলেন চার্লস রবার্ট ডারউইন। তার মৃত্যুতে দেশজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এলো। শত্রুরা উল্লসিত হয়ে উঠল, 'তার মতো ঈশ্বর-বিদ্বেষী পাপীর স্থান হবে নরকে।'

আর্কিমিডিস

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ১০০ মনীষীর জীবনী থেকে

(খ্রিষ্টপূর্ব ২১২-২৮৭)

সাইরাকিউসের সম্রাট হিয়েরো এক স্বর্ণকারকে দিয়ে একটি সোনার মুকুট তৈরি করেছিলেন। মুকুটটি হাতে পাওয়ার পর সম্রাটের মনে হলো এর মধ্যে খাদ মেশানো আছে। কিন্তু স্বর্ণকার খাদের কথা অস্বীকার করল। কিন্তু সম্রাটের মনের সন্দেহ দূর হলো না। তিনি প্রকৃত সত্য নিরূপণের ভার দিলেন রাজদরবারের বিজ্ঞানী আর্কিমিডিসের ওপর।

মহা ভাবনায় পড়ে গেলেন আর্কিমিডিস। সম্রাটের আদেশে মুকুটের কোনো ক্ষতি করা যাবে না। আর্কিমিডিস ভেবে পান না মুকুট না ভেঙে কেমন করে তার খাদ নির্ণয় করবেন। কয়েক দিন কেটে গেল। ক্রমশই অস্থির হয়ে ওঠেন আর্কিমিডিস। একদিন দুপুরবেলায় মুকুটের কথা ভাবতে ভাবতে সমস্ত পোশাক খুলে চৌবাচ্চায় স্নান করতে নেমেছেন। পানিতে শরীর ডুবতেই আর্কিমিডিস লক্ষ করলেন কিছুটা পানি চৌবাচ্চা থেকে উপচে পড়ল। মুহূর্তে তার মাথায় এক নতুন চিন্তার উন্মেষ হলো। এক লাফে চৌবাচ্চা থেকে উঠে পড়লেন। তিনি ভুলে গেলেন তার শরীরে কোনো পোশাক নেই। সমস্যা সমাধানের আনন্দে নগ্ন অবস্থাতেই ছুটে গেলেন রাজদরবারে।

মুকুটের সমান ওজনের সোনা নিলেন। এক পাত্র পানিতে মুকুটটি ডোবালেন। দেখা গেল খানিকটা পানি উপচে পড়ল। এবার মুকুটের ওজনের সমান সোনা নিয়ে জলপূর্ণ পাত্রে ডোবানো হলো। যে পরিমাণ পানি উপচে পড়ল তা ওজন করে দেখা গেল আগের উপচে পড়া পানি থেকে তার ওজন আলাদা। আর্কিমিডিস বললেন, মুকুটে খাদ মেশানো আছে। কারণ যদি মুকুট সম্পূর্ণ সোনার হতো তবে দুটি ক্ষেত্রেই উপচে পড়া পানির ওজন সমান হতো।

কৈশোর ও যৌবনে তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় গিয়ে পড়াশোনা করেছেন। সেই সময় আলেকজান্দ্রিয়া ছিল জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার পীঠস্থান। ছাত্র অবস্থাতেই আর্কিমিডিস তার অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও সুমধুর ব্যক্তিত্বের জন্য সর্বজন পরিচিত হয়ে ওঠেন। তার গুরু ছিলেন ক্যানন। ক্যানন ছিলেন জ্যামিতির জনক মহান ইউক্লিডের ছাত্র। পূর্বসূরিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি চেয়েছিলেন গণিতবিদ

হবেন। অঙ্কশাস্ত্র, বিশেষ করে জ্যামিতিতে তার আগ্রহ ছিল সবচেয়ে বেশি। ইউক্লিড, ক্যানন যেখানে তাদের বিষয় সমাপ্ত করেছিলেন আর্কিমিডিস সেখান থেকেই তার কাজ আরম্ভ করেন।

আর্কিমিডিসের জন্ম আনুমানিক খ্রিষ্টপূর্ব ২১২ সালে। সিসিলি দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত সাইরাকিউস দ্বীপে। পিতা ফেইদিয়াস ছিলেন একজন জ্যোতির্বিদ।

আর্কিমিডিস যুদ্ধকে ঘৃণা করতেন। কারো আজ্ঞাবহ হয়ে কাজ করাও তার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। কিন্তু যেহেতু তিনি ছিলেন সাইরাকিউসের প্রজা, সম্রাট হিয়েরোর রাজকর্মচারী, তাই নিরুপায় হয়েই তাকে সম্রাটের আদেশ মেনে চলতে হতো। সম্রাটের আদেশেই তিনি প্রায় ৪০টি আবিষ্কার করেন। তার মধ্যে কিছু ব্যবসায়িক জিনিস হলেও অধিকাংশই ছিল সামরিক বিভাগের প্রয়োজনে।

আর্কিমিডিসের একক আবিষ্কার পুলি ও লিভার। একবার কোনো একটি জাহাজ চরায় এমনভাবে আটকে গিয়েছিল যে তাকে আর কোনোভাবেই পানিতে ভাসানো সম্ভব হচ্ছিল না। আর্কিমিডিস ভালোভাবে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করলেন। তার মনে হলো একমাত্র যদি এই জাহাজটিকে উঁচু করে তোলা যায় তবেই জাহাজটিকে পানিতে ভাসানো সম্ভব। আর্কিমিডিসের কথা শুনে সকলে হেসেই উড়িয়ে দিল।

অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই উদ্ভাবন করলেন লিভার আর পুলি। জাহাজ ঘাটে একটা উঁচু জায়গায় লিভার খাটানোর ব্যবস্থা করলেন। তার মধ্যে বিরাট একটা দড়ি বেঁধে দিলেন। দড়ির একটা প্রান্ত জাহাজের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা হলো।

এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখতে সম্রাট হিয়েরো নিজেই এলেন জাহাজ ঘাটায়। নগর ভেঙে যেখানে যত মানুষ ছিল সকলে জড়ো হয়েছে। আর্কিমিডিস সম্রাটকে অনুরোধ করলেন লিভার লাগানো দড়ির আরেকটা প্রান্ত ধরে টানতে। আর্কিমিডিসের কথায় সম্রাট তার সমস্ত শক্তি দিয়ে দড়িটা ধরে টান দিলেন। সাথে সাথে অবাক কাণ্ড। নড়ে উঠল জাহাজটি। চারদিকে চিৎকার উঠল। এবার সম্রাটের সাথে দড়িতে হাত লাগালেন আরো অনেকে। সকলে মিলে টান দিতেই সত্যি সত্যি জাহাজ শূন্যে উঠতে আরম্ভ করল। সম্রাট আনন্দে বুকে জড়িয়ে ধরলেন আর্কিমিডিসকে।

এই আবিষ্কারের ফলে বড় বড় পাথর, ভারী জিনিস, কুয়া থেকে জল তোলার কাজ সহজ হলো। একবার আর্কিমিডিস গর্ব করে বলেছিলেন, আমি যদি পৃথিবীর বাইরে দাঁড়ানোর একটু জায়গা পেতাম তবে আমি আমার এই লিভার পুলির সাহায্যে পৃথিবীটাকে নাড়িয়ে দিতাম।

রোমান সেনাপতি সাইরাকিউস দখল করে নেন। মার্কিউলাস আদেশ দিয়েছিলেন আর্কিমিডিসকে যেন হত্যা না করা হয়। তাকে সম্মানে তার কাছে নিয়ে আসা হয় কারণ তিনি সচক্ষে দেখতে চেয়েছিলেন সেই মহান বিজ্ঞানীকে যিনি একাই তার বিশাল বাহিনীকে প্রতিহত করেছিলেন।

কিন্তু সৈনিকদের কেউই আর্কিমিডিসকে চিনত না। তারা সমস্ত নগরময় অনুসন্ধান করতে আরম্ভ করল। আত্মভোলা আর্কিমিডিস তখন আপন মনে গবেষণার কাজ করে চলেছেন। শত্রুপক্ষের যুদ্ধ জয়ের কোনো সংবাদই তিনি রাখেন না। খোঁজ করতে করতে একজন সৈন্য দেখতে পেল এক বৃদ্ধ সারা মুখে সাদা দাড়ি। নিজের কুটিরের সামনে বসে আপনমনে চক খড়ি দিয়ে মেঝের ওপর বৃত্ত আঁকছে।

সৈনিকটি বলে উঠল, তুমি আমার সঙ্গে চল, আমাদের সেনাপতি তোমার খোঁজ করছেন। বৃদ্ধ আর্কিমিডিস বলে উঠলেন, আমি এখন ব্যস্ত আছি। কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোথাও যেতে পারব না।

এ ধরনের কথা শোনার জন্য প্রস্তুত ছিল না রোমান সৈন্যটি। তাকে যে আদেশ দেয়া হয়েছে তাকে তা পালন করতেই হবে। আর্কিমিডিসের হাত ধরতেই এক টানে ছাড়িয়ে নিলেন আর্কিমিডিস।

আমার কাজ শেষ না হলে কোথাও যেতে পারব না।

আর সহ্য করতে পারল না সৈনিক। পরাজিত দেশের এক নাগরিকের এতদূর স্পর্ধা, তার হুকুম অগ্রাহ্য করে! একটানে কোমরের তলোয়ার বের করে ছিন্ন করল মহা বিজ্ঞানীর দেহ। রক্তের ধারায় শেষ হয়ে গেল তার অসমাপ্ত কাজ।

আর্কিমিডিসকে হত্যা করা হয়েছিল সম্ভবত ২৮৭ সালে। বিজ্ঞানীর ছিন্ন মুন্ডু দেখে গভীরভাবে দুঃখিত হয়েছিলেন মার্কিউলাস। তিনি মর্যাদার সাথে আর্কিমিডিসের দেহ সমাহিত করেন।

মহাবিজ্ঞানী আর্কিমিডিসের আবিষ্কার সম্বন্ধে সঠিক কোনো তথ্য জানা যায় না। সামরিক প্রয়োজনে যন্ত্রপাতি আবষ্কার করলেও ওই বিষয়ে তার কোনো আগ্রহ ছিল না। মূলত গাণিতিক বিষয়েই ছিল তার আগ্রহ। দিনের অধিকাংশ সময়ে তিনি গবেষণায় নিমগ্ন থাকতেন। বাইরের জগতের সব কথাই তিনি তখন ভুলে যেতেন। এমন বহু সময় গেছে তার কাজের লোক তাকে খাবার দিয়ে গেছে অথচ সারাদিনে তিনি সেই খাবার সপর্শই করেননি। ভুলেই গিয়েছিলেন খাবারের কথা। খোঁজ করে দেখা গেল তিনি স্নানাগারের দেয়ালেই অঙ্ক কষে চলেছেন। বলবিদ্যা, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত বিষয়ে তার রচনার সংখ্যা বারোটি। এছাড়া তিনি আর যে সমস্ত রচনা করেছিলেন তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না।

গণিতসংক্রান্ত ব্যাপারে আর্কিমিডিসের উল্লেখযোগ্য আবিষকার হলো-

১. বৃত্তের পরিধি এবং ব্যাসের অনুপাত ৩১০/৭১ ও ৩১/৭-এর মধ্যে অবস্থিত।

২. অধিবৃত্তীয় অংশগুলোর ক্ষেত্রফল নির্ধারণ করেছিলেন।

৩. শঙ্ককৃতি এবং গোলাকৃতি বস্তু সম্বন্ধে ৩২টি প্রতিজ্ঞা উদ্ভাবন করেছিলেন।

৪. বলবিদ্যার তত্ত্বের ভিত হিসেবে সমতল ক্ষেত্রের সাম্যতা সম্বন্ধে তত্ত্ব নির্ধারণ করেন।

তার বহু আবিষকৃত সত্য আজও বিজ্ঞানীদের পথ নির্দেশ করে।

(ইন্টারনেট হতে সংগ্রহীত)

Tanbir Ahmad Razib

Mobile No:→ 01738 -359555//01916-457075

E --Mail: →tanbir_cox@yahoo.com //tanbir.cox@gmail.com

Facebook: → http://www.facebook.com/tanbir.cox

Web Site : → http:// tanbir.99k.org

_DO
_NOT
_FORGET
_TO
_call!
_And TO
_Say
_Thanks

Any comments and critics are welcome.

All Copy right -T@NB!R.